মোশাররফ হোসেন খান

সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর

মোশাররফ হোসেন খান
সাইয়েদ
নিসার আলী
তিতুমীর

সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর

মোশাররফ হোসেন খান

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা

প্রকাশক
এ. কে. এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড
ঢাকা-১২০৫

ISBN 984-31-0717-9

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯৯
দ্বিতীয় প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৬
তৃতীয় প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৭

প্রচ্ছদ
গোলাম মাওলা

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা।

বিনিময় : পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Syed Nisar Ali Titumeer Written by Mosharraf Hossain Khan Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 First Edition December 1999 Third Edition November 2007 Price Taka 50.00 only.

সূচীক্রম

জন্ম ঃ আলোকিত ভুবনে

চব্বিশ পরগণা জিলার চাঁদপুর গ্রাম। গোবরডাঙ্গা স্টেশন থেকে বারো-চৌদ্দ ক্রোশ দূরে। কয়েক মাইল উত্তরে ইতিহাসখ্যাত নারিকেল বাড়িয়া। আর মাত্র দুই ক্রোশ দূরে ইছামতী নদী। এরই মাঝখানের একটি গ্রাম— চাঁদপুর।

গ্রামটি খুব শান্ত। চারদিকে কেবল গাছ-পালা। ফসলের ক্ষেত। যেদিকে চোখ যায় কেবল সবুজ আর সবুজ। গাছে গাছে পাখির কলরব। ইছামতী নদীর কুলুকুলু স্রোতের ডাক।

খুব ভোরে ফজরের সুমধুর আযানের ধ্বনিতে ঘুম থেকে জেগে ওঠে চাঁদপুর গ্রামের মানুষ। তারপর মেঠোপথ ধরে ছুটে চলে ক্ষেতের দিকে।

এই সবুজ-শ্যামল চাঁদপুর গ্রামের একটি বিখ্যাত পরিবার। বহুকাল থেকে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে।

নাম— সাইয়েদ এবং মীর পরিবার।

'সাইয়েদ' এবং 'মীর' পরিবারের রহস্যটা একটু পরে জানা যাবে। তার আগে জানা যাক নিসার আলীর জন্মের কথাটা।

সতেরো শো বিরাশি সাল।

দিনটির কথা এখন আর কেউ মনে করতে পারে না। তা না পারুক।

আকাশে সূর্য উঠলে তো সবাই জেনে যায়। তখন চারদিকে কেমন সোনালী আলো। চারদিকে তখন কেবল রোদ্দুরের ঝলকানি। ঠিক তেমনি।—

তেমনি অবস্থা হয়েছিল সেদিন। সতেরো শো বিরাশি সালের সেই ঐতিহাসিক দিনটিতে। তাঁর জন্মের মুহূর্তে। ভূমিষ্ঠ হলেন তিনি।

তিনি মানে— সাইয়েদ নিসার আলী।

বাংলার ইতিহাসের এক আলোকিত পুরুষ।

তিনি ভূমিষ্ঠ হলেন এই দিনে। চাঁদপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে।

পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল সতেরো শো সাতান্ন সালে। ২৩ শে জুন। আর নিসার আলী জন্মগ্রহণ করলেন সতেরো শো বিরাশি সালে। অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের পঁচিশ বছর পর।

নিসার আলীর পিতার নাম— সাইয়েদ হাসান আলী। আর মায়ের নাম— আবেদা রোকাইয়া খাতুন।

নিসার আলী— 'তিতুমীর' নামেই আমাদের কাছে অনেক বেশি পরিচিত।

আসলে 'তিতুমীর' তাঁর কোনো নাম নয়। এমনকি ডাকনামও নয়। তাঁর প্রকৃত নাম— সাইয়েদ নিসার আলী। তবুও তিনি 'তিতুমীর' নামে পরিচিত হলেন কিভাবে?

সে এক মজার ব্যাপার বটে।

সেই ঘটনাটিই আগে জেনে নেয়া যাক।

তিতুমীর নামের গোপন রহস্য

খুব ছোটোকালে। ছোটোকালে নিসার আলী ছিলেন খুব হালকা পাতলা। একদিকে ছিলেন রোগাটে, অন্যদিকে ছিলেন দারুণ দুর্বল।

রোগ ব্যাধিতে সব সময় ভুগতেন তিনি। মেজাজটাও তাই হয়ে উঠেছিল বেজায় খিটখিটে।

শরীর সুস্থ না থাকলে পৃথিবীর কোনো কিছুই ভালো লাগেনা।

নিসার আলীর অবস্থাও হয়েছিল তাই। খাওয়ায় রুচি নেই। খেলায় মন নেই। সারাদিন কেবল ঘ্যানর ঘ্যানর। কান্না শুধু কান্না।

তিনি ছিলেন পরিবারের সবার কাছে চোখের মণি। কলিজার টুকরো। আদর যত্ন আর সেবার কোনো কমতি নেই। তবুও সুস্থ হয়না নিসার আলীর শরীর-স্বাস্থ্য।

তাঁকে নিয়ে মহাভাবনায় পড়লেন পিতা হাসান আলী। আর মা রোকাইয়া তো ছেলের জন্যে ভাবতে ভাবতে প্রায় নাওয়া খাওয়াই ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু দাদী ?

তিনিও ভাবেন। ভাবেন অতি আদরের নিসারকে নিয়ে।

না ভেবে কি উপায় আছে ?

নিসার তো কেবল একটি ছেলেই শুধু নন। তিনি একটি পরিবারের ভবিষ্যত। একটি পরিবারের জ্বলজ্বলে পিদিম।

দাদী ভাবেন, যে করে হোক নিসারকে সুস্থ করে তুলতে হবে।

দাদী হেকিম ডাকেন। কবিরাজ ডাকেন। ওষুধের পর ওষুধ চলে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়না।

তবুও হতাশ হন না দাদী। নিরাশ হন না আল্লাহর অপার রহমত থেকে।

চেষ্টা চালাতে থাকেন তিনি।

জ্ঞানী-গুণীদের পরামর্শ নেন দাদী। পরামর্শ নেন হেকিম এবং কবিরাজের।

তারা বলেন, গাছগাছালির ছাল, পাতা আর লতা-গুল্মের ভেতর রয়েছে নিসার আলীর জন্যে প্রকৃত ওষুধ।

গাছগাছালির ছাল এবং লতাপাতার ভেতর রয়েছে অনেক গুণ। রয়েছে অনেক শক্তি।

দাদী এবার নজর দিলেন সেই দিকে। হাত বাড়ালেন বনোজ ওষুধের দিকে।

সারাদিন তিনি এইসব যোগাড়ের চেষ্টায় থাকেন। প্রয়োজনীয় লতাপাতা যেখানেই পাওয়া যায় সেখান থেকেই দাদী সংগ্রহ করান লোকজন দিয়ে।

তারপর সেই লতাপাতা আর গাছের ছাল বেটে তার রস খাওয়ান প্রাণপ্রিয় নিসার আলীকে।

গাছের লতাপাতার রস যে তিতা, সে কথা সবাই জানে।

নিসার আলীও তা জানেন। তবুও তিনি কেমন মজা করে সেই তিতা রস ঢক ঢক করে গিলে ফেলেন। অনায়াসে । পান করে যান সেইসব।

দাদী বাটি বাটি তিতা রস নিসার আলীর মুখের সামনে তুলে ধরেন। আর নিসার আলী মধু পান করার মতো তা নিমিষেই সাবাড় করে দেন।

দাদী তো অবাক।

কি আশ্চর্যের কথা!

যে তিতা ওষুধ অন্যান্য শিশুদের নাক মুখ চেপে ধরে খাওয়াতে হয়, তা কিনা নিসার আলী তৃপ্তির সাথেই পান করে!

পড়শিরাও কাণ্ড দেখে হতবাক। দাদী নিসার আলীকে আদরে আদরে ভরে দেন। ভরে দেন নিসার আলীর হৃদয়-মন।

দাদীর হৃদয় উজাড় করা আদর স্নেহে দুকূল ছাপিয়ে ওঠে নিসার আলীর মনের বিশাল সমুদ্র।

পড়শিরা তাকিয়ে থাকেন দাদীর দিকে। তাকিয়ে থাকেন নিসার আলীর দিকে। তাদের চোখে মুখে বিস্ময়ভরা জিজ্ঞাসার তুফান।

সেই তুফান ভেঙ্গে হেসে ওঠেন ধবধবে জোছনার মতো মহীয়সী দাদী।

আদর করে আরও কাছে টেনে নেন কলিজার মানিক নিসার আলীকে। সোহাগ করতে করতে বলেন—

এ আমার সোনার টুকরো। আমার বংশের প্রদীপ। আমার আদরের 'তিতামীর'।

কোনো রকম কান্নাকাটি আর বায়না ছাড়া নিসার আলী দাদীর দেয়া সেই তিতা ওষুধ পান করতেন বলে দাদী তাঁকে সোহাগ করে ডাকলেন 'তিতামীর' বলে।

ব্যাস! আর যায় কোথায়!

সেই থেকেই শুরু।

দাদীর সেই সোহাগের ডাক থেকেই বাড়ির অন্যান্যরা তাঁকে মাঝে মাঝে ডাকতে থাকেন তিতামীর বলে। সেটিও ছিল আদর আর সোহাগে ভরা ডাক।

কিন্তু তারপর। তারপর আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে সেই তিতামীর নামটি ছড়িয়ে পড়লো পরিবারের বাইরে। পড়শির মধ্যে। গ্রামের আর দশজনের মাঝে।

এভাবেই 'তিতামীর' ক্রমশ হয়ে গেলেন আর একটু বদলে 'তিতুমীর'।

কালে কালে তিতুমীর নামটি এতোই জনপ্রিয় এবং পরিচিত হয়ে উঠলো যে তাঁর আসল নামটিও ঢাকা পড়ে গেল অনেকটা কুয়াশার ভেতর।

সাইয়েদ নিসার আলী নামটি এখনো সাধারণ মানুষ তেমন করে জানেন না। এই নামটি তো এতোদিনে অনেকে ভুলতেই বসেছে।

অধিকাংশ মানুষই তাঁকে 'তিতুমীর' বলেই জানে।

সাইয়েদ নিসার আলীকে আর কজনইবা চেনে?

তবু এটাই সঠিক। এটাই তাঁর প্রকৃত নাম। তাঁর প্রকৃত নাম— সাইয়েদ নিসার আলী।

অনেকেই মনে করেন, নিসার আলীর জন্ম হয়েছিল একটি অতি সাধারণ

কৃষক পরিবারে।

কিন্তু কথাটি সত্য নয়।

বরং তিনি জন্মেছিলেন একটি বিখ্যাত পরিবারে। খান্দানী বংশে।

সেই খান্দানী পরিবারটি ছিল যেমনি নামী-দামী, তেমনি মর্যাদাসম্পন্ন। দু-দশ গ্রাম জুড়ে ছিল এই পরিবারটির সুনাম-সুযশ। ছিল তাদের নাম ডাক। আশ-পাশের সবাই শ্রদ্ধা করতো পরিবারটিকে।

এখন আমরা নিসার আলীর বংশের সেই গৌরবগাঁথা কিছু কথা জানবো। সেই সাথে জানবো তাঁর বংশের উজ্জ্বলতম আরও কিছু তথ্য।

যা কিনা একেকটি হীরক খণ্ডের মতোই অত্যন্ত মূল্যবান। গুরুত্বপূর্ণ।

বংশ পরিচয়

নিসার আলীর জন্ম হয়েছিল সাইয়েদ ও মীর নামক একটি বিখ্যাত বংশে।

কিন্তু ইংরেজরা সেই সময় প্রকৃত সত্যকে পাশ কেটে বিকৃত ইতিহাস তুলে ধরেছিল।

ইংরেজরা কখনো মুসলমানকে ভালো চোখে দেখেনি। মুসলমানকে তারা সব সময় খারাপ চোখে দেখতো। ছোট করে দেখতো। ঘৃণার চোখে তাকাতো। আর নানান কূট-কৌশলে মুসলমানদেরকে অপমান করার চেষ্টা করতো। তারা ছিলো মিথ্যার জাহাজ। মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা লেখা এবং মিথ্যা ভাষণে তাদের কোনো জুড়ি ছিল না।

কিভাবে তারা মুসলমানকে হেয় এবং ছোট করতে পারে সেই চিন্তাতেই তারা মশগুল থাকতো। আর মুসলিম নেতা, মুসলিম বীর এবং মুসলিম শাসকদেরকে তো ইংরেজরা কখনো সহ্যই করতে পারতো না। এজন্যে তারা তাদের নামে, তাদের পরিবার ও তাদের চরিত্রের ওপর মিথ্যা কলংক লাগিয়ে দিতো।

ঠিক তেমনটি করতো তারা ইতিহাসের ক্ষেত্রেও।

মুখের কথা তো আর বেশি দিনটিকে থাকেনা। কিন্তু ইতিহাস? ইতিহাস তো বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত টিকে থাকে।

ইংরেজরা একদিকে ছিল যেমন শিক্ষিত, অপর দিকে ছিল তেমনি চালাক এবং ধূর্ত।

তারা জানতো, কোনো মুসলমান সম্পর্কে কিংবা কোনো মুসলিম বীর বা নেতা সম্পর্কে যদি ইতিহাসে একবার খারাপ চরিত্রে, কুৎসিতভাবে তুলে ধরা যায় তাহলে তা শত-সহস্র বছর ধরে চালু থাকবে। হোকনা তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। হোক না তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক বা বানানো কথা। তবুও তাই পড়বে

সবাই। পড়বে আর ভাববে, হয়তো এটাই সঠিক ইতিহাস।

ইংরেজদের এই মিথ্যা এবং ভুল ইতিহাস লেখার কারণ— ওই যে বললাম, আমাদের পূর্ব পুরুষকে ছোট করে তুলে ধরা! যাতে করে উত্তর প্রজন্মরা তাদের পূর্ব পুরুষকে ঘৃণা করে। তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে।

তাই কি হয় ? ষড়যন্ত্র আর মিথ্যা যত নিখুঁতই হোক না কেন, সত্যের একটা আলাদা ক্ষমতা আছে। বিশাল ক্ষমতা। সত্য তো সত্যই। সূর্যের মতো। কেউ তাকে রুখতে পারে না। সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গের মতো। কেউ তাকে দাবিয়ে রাখতে পারে না।

যা সত্য তা একদিন না একদিন প্রকাশ হয়েই পড়ে। আর যখন প্রকৃত সত্য ভোরের সূর্যের মতো ভেসে ওঠে, তখন মিথ্যা আড়ালে চলে যায়।

এভাবে একদিন আবারও লেখা হয় সত্য ইতিহাস। খসে পড়ে মিথ্যা ইতিহাসের নোংরা পাতা। বদলে যায় ইতিহাসের পুরনো চেহারা।

ঠিক এমনটি হয়েছে সাইয়েদ নিসার আলীর ক্ষেত্রে।

নিসার আলী আজীবন সংগ্রাম করেছেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। ইংরেজ শাসন, দুঃশাসন এবং শোষণের বিরুদ্ধে।

তাঁর সংগ্রামের কথা আমরা পরে জানবো। তার আগে নিসার আলীর বংশ পরিচয়টা জেনে নেয়া যাক।

ইংরেজের বিরুদ্ধে সব সময় লড়বার কারণে নিসার আলীকে তারা আদৌ ভালো চোখে দেখতো না। তারা চেষ্টা করতো কিভাবে বাংলার এই দুঃসাহসী বীরকে পরাস্ত করা যায়।

নিসার আলীকে ছোট করার জন্যে তাঁর সম্পর্কে ইংরেজরা অনেক মিথ্যা এবং বানানো কাহিনী লিখেছে। তাঁর পরিবার এবং বংশ পরিচয়েও রয়েছে সেই মিথ্যার ছলচাতুরি। এভাবে তারা নিসার আলীর জীবনেতিহাসকে কলংকিত করতে চেয়েছে।

ইংরেজ ঐতিহাসিকরা লিখেছে— নিসার আলী একটি সামান্য কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যে পরিবারটি ছিল মূর্খ এবং অশিক্ষিত।

আসলে কিন্তু তা নয়।

ইংরেজদের এই তথ্যটি সম্পূর্ণ ভুল। ভুল এবং মিথ্যা। মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন।

নিসার আলীকে আমাদের কাছে খাটো করে দেখানোর জন্যে চতুর ইংরেজরা এই মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল।

আমরা হয়তো অনেকেই জানিনা। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, নিসার আলী জন্মেছিলেন একটি বিখ্যাত এবং নামকরা বিরাট পরিবারে। বহুদূর পর্যন্ত ছিল সেই পরিবারটির সুনাম- সুখ্যাতি।

শুধু এক পুরুষ নয়। কয়েক পুরুষ আগে থেকেও এই পরিবারটি ছিল খুবই মর্যাদা সম্পন্ন। ধন সম্পদে, বিত্ত-বৈভবে, ধর্মীয় আচার আচরণে, সম্মানে, মর্যাদায়, গৌরবে— মোট কথা, সকল দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল নিসার আলীর পূর্ব পুরুষেরা। শ্রেষ্ঠ ছিল তাঁর পরিবারটি।

বহুকাল আগের কথা। নিসার আলীর জন্মেরও অনেক-অনেক দিন পূর্বের কথা।

তখন সুদূর আরব দেশ থেকে অলি-দরবেশ আসতেন এই উপমহাদেশে। আসতেন নদী সমুদ্র পার হয়ে এই বাংলায়। তারা আসতেন সত্যের আলো জ্বালাতে। আসতেন দীন ইসলামের মশাল হাতে নিয়ে। ইসলাম প্রচারের জন্যে তাঁরা বাংলার বিভিন্ন শহরে বন্দরে, বিভিন্ন গ্রামে, বিভিন্ন প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁরা এই বাংলার অন্ধকার ঘরে আবার সত্যের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতেন।

তাঁরা মানুষকে ডাকতেন সত্যের পথে।

ইসলামের পথে।

আল্লাহর পথে।

আলোর পথে।

আজ আমাদের মধ্যে ইসলামের যে আলোটুকু জ্বলছে তা সেই সব অলি-দরবেশদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায়। তাঁদের ত্যাগ, কুরবানী আর পরিশ্রমেই আজ

এদেশে ইসলামের এই জাগরণ।

তখন যে সব অলি-দরবেশ এ দেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্যে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত দু জন অলি-দরবেশ।

তাঁদের একজনের নাম— সাইয়েদ শাহ্ হাসান রাজী। আর অপর জনের নাম— সাইয়েদ শাহ্ জালাল রাজী।

এই দুজন অলি-দরবেশের নাম পুরনো দলিল দস্তাবেজেও আছে।

ইসলাম প্রচারের জন্যে তাঁদের ত্যাগ ও কুরবানী ছিল অপরিসীম। তাঁদের দীন প্রচারের ব্যাপ্তি ছিল বহুদূর। বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁদের কাজের পরিধি। আর তাঁদের সুন্দর চরিত্র ও আচরণের খ্যাতি ছিল সেই সময়ের সকল মানুষের মুখে মুখে।

তাঁদের সত্যের আহ্বানে তখন সাড়া পড়ে গিয়েছিল চারদিকে। দলে দলে লোক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল। তাঁদের কাছে এসে সদ্য আলোকপ্রাপ্ত মানুষেরা তৃপ্তি পেত। আনন্দ পেত। পেত হৃদয় ও মনের খোরাক।

একদিন সেই দুজন অলি-দরবেশের কাছে গেলেন দুজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁদের একজনের নাম— সাইয়েদ শাহ আব্বাস আলী এবং অন্যজনের নাম— সাইয়েদ শাহ্ শাহাদাত আলী।

তাঁরা দুজনই ছিলেন আপন ভাই।

আব্বাস আলী এবং শাহাদাত আলী এই দুই ভাই দুজন অলি-দরবেশের কাছে গিয়ে তাঁদের হৃদয়ের আকুতি জানালেন। দুই ভাই সেই দিনই ওই দুজন অলি-দরবেশের কাছে মুরীদ হলেন।

সেই দিন থেকে দুই ভাই হয়ে গেলেন তাঁদের খলীফা। তাঁদের শিষ্য। মনে-প্রাণে দুই ভাই ইসলামকে ধারণ করে তা প্রচার প্রসারের জন্যে চেষ্টা করতে থাকলেন। কালে কালে তাঁদের ত্যাগ এবং কুরবানীতে চারদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তাঁদের আচরণ, তাঁদের ব্যবহার, তাঁদের জীবনের সব— সব কিছুই ছিল ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী। তাঁরা সব সময় ইসলামের হুকুম

আহ্‌কাম মেনে চলতেন। মেনে চলতেন আল্লাহর আদেশ-নিষেধ। তাঁরাও পথভোলা মানুষকে ডাকতেন। ডাকতেন আলোর পথে। ডাকতেন সত্যের পথে।

সাইয়েদ আব্বাস আলী এবং সাইয়েদ শাহাদাত আলী ইসলামের খেদমতে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গ করেছিলেন দীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে।

মানুষকে সত্য পথে ডাকতে হলে অবশ্যই সমাজে বসবাস করে ডাকতে হবে।

সমাজের দশজনের সাথে না মিশলে, সমাজের মানুষের সাথে সম্পর্ক না রাখলে মানুষ তাদের কথা শুনবে কেন?

সাইয়েদ আব্বাস আলী ও সাইয়েদ শাহাদাত আলীও একথা ভালো করে জানতেন। তাঁরাও ছিলেন সমাজবদ্ধ। ছিলেন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং বিখ্যাত। তাঁরাও ছিলেন অন্য দশজনের মতো সংসারী। ছিলেন সামাজিক মানুষ।

একদিন সাইয়েদ শাহাদাতের ঘরে জন্ম নিলেন একটি পুত্র সন্তান। নাম রাখলেন সাইয়েদ শাহ্ হাশমত আলী।

হাশমত আলীও বড়ো হয়ে পিতা এবং চাচার পদাংক অনুসরণ করেছিলেন। তিনিও তাঁদের মতো ইসলামের খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

এই বিখ্যাত সাইয়েদ পরিবারেই একদিন জন্ম নিলেন বাংলার সাহসী পুরুষ, দুঃসাহসী মুজাহিদ— সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর।

নিসার আলী ছিলেন তাঁর পূর্ব পুরুষ সাইয়েদ শাহ্ হাশমত আলীর ত্রিশতম অধস্তন।

তাঁর পিতা সাইয়েদ হাসান আলীও ছিলেন একজন সুপরিচিত বিখ্যাত ব্যক্তি। ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যে গৌরবোজ্জ্বল ছিল তাঁর পরিবারটি।

যে বংশীয় গৌরব, মর্যাদা এবং আদর্শ-ঐতিহ্য এই পরিবারে প্রবেশ করেছিল শতশত বছর আগে, সেই বংশীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ন ছিল শত শত বছর পরেও।

কয়েক শতকের মর্যাদা সম্পন্ন নিসার আলীর এই বংশটি সাইয়েদ এবং মীর উভয় পরিচয়েই সবার কাছে পরিচিত ছিল।

তাঁর পূর্বে এই বংশেই জন্ম নিয়েছেন বেশ কিছু অলি-দরবেশ। তাঁদের পরিচিতিও ছিল অনেক ব্যাপক।

নিসার আলী কোনো অখ্যাত বা মূর্খ পরিবারে জন্ম নেননি। তিনি জন্ম নেননি নাম-নিশানাহীন কোনো অজ্ঞাত কৃষক পরিবারেও।

ইংরেজ ঐতিহাসিকরা যে মিথ্যা ইতিহাস তৈরি করেছে তাঁর বংশ সম্পর্কে, তা আদৌ সঠিক নয়। বরং সাইয়েদ নিসার আলীর জন্ম হয়েছিল এমন এক প্রাচীন খান্দানী পরিবারে, যে পরিবারের মান-মর্যাদা এবং গৌরব ছিল অনেক-অনেক বেশি।

সাইয়েদ নিসার আলীর সেই ইতিহাসখ্যাত পরিবার এবং বংশের মতো তেমন শ্রেষ্ঠ বংশ আজও আমাদের মধ্যে বিরল।

কিন্তু এতো বড়ো বংশে জন্মগ্রহণ করেও নিসার আলীর মধ্যে এতোটুকু ছিলনা বংশের অহংকার।

বংশের অহংকার করা ভালো নয়।

বংশের সুনাম-সুখ্যাতি প্রমাণ করতে হয় কাজ দিয়ে। নিজের আচার ব্যবহার আর মনুষত্ব দিয়ে।

নিসার আলী একথা জানতেন। জানতেন খুব ভালো করে। আর জানতেন বলেই তিনি নিজেকে তৈরি করেছিলেন। তৈরি করেছিলেন নিজেকে যোগ্য করে। তিল তিল করে ক্রমশ গড়ে তুলেছিলেন আপন ভিত্তিভূমি।

শিক্ষাজীবন

নিসার আলী যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই সময়ে মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে একটি সুন্দর নিয়ম চালু ছিল। নিয়মটি হলো— শিশুর বয়স যখন পাঁচ বছর পূর্ণ হতো তখনই তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া শুরু হয়ে যেত।

নিয়মটি ছিল চমৎকার। এর ফলে মুসলিম পরিবারে ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ঘটতো ব্যাপকভাবে।

আসলেই তো শিক্ষা ছাড়া সব কিছু অন্ধকার।

যার মধ্যে শিক্ষার আলো নেই, তার মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ কিভাবে জ্বলবে? মনুষত্ব কিভাবে বিস্তার লাভ করবে?

এই মৌলিক কথাগুলো জানতেন নিসার আলীর পিতা হাসান আলী। জানতেন তাঁর মা—আবেদা রোকাইয়া খাতুন। জানতেন বৃদ্ধা দাদীও।

সতেরো শো ছিয়াশি সাল।

নিসার আলীর বয়স তখন মাত্র চার বছর চার মাস চার দিন।

চমৎকার মিল!

ঠিক এই সময়ে পরিবারের সবাই বসে গেলেন গোল হয়ে। পরামর্শ করলেন। সবারই এক কথা। নিসার আলীকে এখন, এই বয়সেই লেখাপড়া শেখানো শুরু করতে হবে।

দাদীও মহা খুশি। বললেন, আমার আদরের তিতামীরকে জলদি লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করো।

যে কথা সেই কাজ।

পরামর্শ শেষ করলেন হাসান আলী। তিনি যেমন ছিলেন সচেতন, তেমনি ছিলেন শিক্ষানুরাগী।

মা রোকাইয়াও ছিলেন তেমনি। শিক্ষার ব্যাপারে তাঁরও ছিল দারুণ আগ্রহ।

ঠিক সেই দিনই কথা মতো পিতা-মাতা অত্যন্ত আনন্দের সাথে নিসার আলীর হাতে তুলে দিলেন তখতী।

সূচনা হলো নিসার আলীর শিক্ষাজীবন। আর এক নতুন জীবন।

সেই সময়ে একজন বিখ্যাত শিক্ষক ছিলেন। নাম— মুনশী মুহাম্মদ লাল মিয়া। মুনশী লাল মিয়া নামেই তিনি সবার কাছে অধিক পরিচিত ছিলেন।

লাল মিয়ার ছিল বিশাল জ্ঞানের বহর। আরবী, উর্দু এবং ফারসী ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল ব্যাপক। তাঁর শিক্ষা দেবার পদ্ধতিও ছিল অত্যন্ত চমৎকার। যার কারণে তখনকার দিনে মুনশী লাল মিয়ার পরিচিতি ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। সবার মুখে মুখে ছিল তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি।

যোগ্য শিক্ষক মুনশী লাল মিয়া। নিসার আলীর আরবী, উর্দু এবং ফারসী ভাষা শিক্ষা দেবার জন্যে হাসান আলী নিযুক্ত করলেন মুনশী লাল মিয়াকে।

লাল মিয়া খুব যত্ন আর আন্তরিকতার সাথে নিসার আলীকে পড়ান। পড়ান দরদ দিয়ে। তিনিও তাঁকে ভালোবাসেন প্রাণ দিয়ে।

পিতা হাসান আলী এবং মা রোকাইয়া সব সময় খোঁজ-খবর রাখেন ছেলের লেখাপড়ার।

নিসার আলীর বয়স তখন খুবই অল্প। তবুও সেই অল্প বয়সে তাঁর শিক্ষার প্রতি ছিল দারুণ আগ্রহ।

খান্দানী পরিবারের সন্তান হবার কারণে পরিবারের সেই উজ্জ্বল আদর্শ ও ঐতিহ্য ছিল নিসার আলীর অনিবার্য ভূষণ।

লেখাপড়ায় খুবই মনোযোগী ছিলেন নিসার আলী। সেই সাথে ছিল তাঁর ক্ষুরধার মেধা। খুব সহজেই, অল্প সময়ের মধ্যে তিনি আরবী, উর্দু এবং ফারসী ভাষার নানান দিকগুলো শিখে নিতে পারতেন।

তাঁর লেখাপড়ার প্রতি অসীম আগ্রহ দেখে খুশি হলেন পিতা। খুশি হলেন মা-ও।

তখনও ঐ তিনটি ভাষা শিখছেন নিসার আলী। তখনও চলছে মুনশী লাল মিয়ার প্রতিদিনের তালিম। নিসার আলীও একটু একটু করে অনেক দূর

এগিয়ে গেছেন শিক্ষার ক্ষেত্রে।

কিন্তু এতোটুকুতে সম্পূর্ণ খুশি নন নিসার আলীর পিতা-মাতা। তাঁরা চান— শুধু বিদেশী ভাষা নয়, শুধু ধর্মীয় শিক্ষাই নয়, আধুনিক শিক্ষায়ও ছেলেকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাঁকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে অন্যান্য ভাষার পাশাপাশি মাতৃভাষা বাংলাতেও।

কারণ, এই বিখ্যাত পরিবারটি বাংলা ভাষাতেও ছিল পূর্ব থেকেই শিক্ষিত। বাংলা ভাষার প্রতি তাই তাঁদের ছিল অকৃত্রিম হৃদয়ের টান। মাতৃভাষার প্রতি তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল।

ভাবতে থাকলেন তাঁরা। ভাবলেন, কাকে নিযুক্ত করা যায় নিসার আলীকে বাংলা ভাষা শেখাবার জন্যে? তেমন যোগ্য বাংলার শিক্ষক কোথায় পাওয়া যায়?

খোঁজ করতে থাকলেন তাঁরা চারপাশ।

হঠাৎ তাঁদের খেয়াল হলো— পণ্ডিত রাম কমল ভট্টাচার্যের কথা।

রাম কমল ভট্টাচার্য ছিলেন একজন মস্ত বড়ো পণ্ডিত। বাংলা ভাষায় তিনি খুব দক্ষ। তাঁর বাড়িটি ছিল শেরপুর গ্রামে। গ্রামটি চাঁদপুরের পাশেই।

একদিন পণ্ডিত রাম কমল ভট্টাচার্যকে ডেকে পাঠালেন হাসান আলী। রাম কমল এলে তাঁকে বললেন, আমি নিসার আলীর বাংলা ভাষা শেখাবার দায়িত্ব আপনাকে দিতে চাই। আপনি কি সময় করতে পারবেন?

রাম কমল খুব খুশি হলেন হাসান আলীর কথায়।

এতো বড়ো খান্দানী পরিবারের ছেলের শিক্ষক হওয়াটাকে তিনি গৌরবজনক বলে মনে করলেন।

হাসান আলীর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন পণ্ডিত রাম কমল।

আরবী, উর্দু এবং ফারসী ভাষার পাশাপাশি এবার চলতে থাকলো নিসার আলীর বাংলা ভাষার চর্চা। নিসার আলীর বাংলা ভাষার প্রতিও ছিল দারুণ ঝোঁক।

শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর মনোযোগ আর আগ্রহ দেখে অবাক হলেন পণ্ডিত

রাম কমল। বাংলার পাশাপাশি তিনি ধারাপাত, অংক প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষা দিতে থাকলেন নিসার আলীকে।

ঠিক এমনি সময়।

এমনি সময়ে সুদূর বিহার শরীফ থেকে একদিন চাঁদপুর গ্রামে এলেন একজন বিখ্যাত আলেম। নাম— হাফেজ নিয়ামতুল্লাহ।

হাফেজ নিয়ামতুল্লাহ ছিলেন একজন মস্তবড়ো আলেম। ছিলেন শিক্ষাবিদ।

তিনি চাঁদপুর গ্রামে এলে খবরটি ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। খবরটি শুনলেন নিসার আলীর পিতা হাসান আলীও।

হাসান আলীর হৃদয়ে ছিল একটি সুপ্ত বাসনা। তাঁর স্বপ্ন ছিল চাঁদপুর গ্রামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা। যোগ্য লোকের অভাবে এতোদিন তিনি সেটা করতে পারেননি।

হাফেজ নিয়ামতুল্লাহকে পেয়ে হাসান আলীর বুকটা আনন্দে ভরে উঠলো। ভাবলেন, এবার তাঁর স্বপ্নের প্রদীপটি জ্বালানো হয়তোবা সম্ভব হবে।

তিনি ডাকলেন গ্রামের সকল মানুষকে। হাসান আলী ছিলেন একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। সমাজে তাঁর শ্রদ্ধা এবং সম্মান ছিল অনেক- অনেক বেশি।

শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হাসান আলীর আহ্বানে একত্রিত হলেন গ্রামের লোক। এবার তিনি তাঁদের সামনে একে একে তুলে ধরলেন শিক্ষার গুরুত্ব। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। সেই সাথে বুঝালেন গ্রামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে।

উপস্থিত সবাই হাসান আলীর কথায় খুব খুশি হলেন। তাঁরা একমত হলেন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে। সিদ্ধান্ত হলো— চাঁদপুরে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হবে। এবং সেই মাদ্রাসার দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন বিহার শরীফ থেকে আগত বিখ্যাত আলেম হাফেজ নিয়ামতুল্লাহ।

কথা মতো চাঁদপুর গ্রামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হলো। সেই মাদ্রাসার দায়িত্বভার দেয়া হলো হাফেজ নিয়ামতুল্লাহর ওপর। তিনিই হলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক।

মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর হাসান আলী আল্লাহকে শুকরিয়া জানালেন। বহুদিনের একটি মহৎ স্বপ্ন-সাধ এবার তাঁর পূরণ হলো।

নিসার আলী ততোদিনে শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছেন আরও অনেক দূর। আরবী, ফারসী এবং উর্দু ভাষায় তিনি যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেছেন। জ্ঞান লাভ করেছেন বাংলা ভাষাতেও। মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠার পর হাসান আলী এবার নিসার আলীকে তুলে দিলেন হাফেজ নিয়ামতুল্লাহর হাতে।

নিয়ামতুল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত যোগ্য শিক্ষক। তাঁর ছিল একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টি। শত শত ছাত্রের ভেতরও তিনি প্রকৃত প্রতিভাকে চিনে নিতে পারতেন। আর অপরদিকে নিসার আলীও ছিলেন তুখোড় ছাত্র। যেমন ছিলেন লেখা-পড়ায় ভালো, তেমনি ছিল তাঁর চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব। সহজেই চোখে পড়ার মতো। দারুণ যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন নিসার আলী। ফলে প্রিয় শিক্ষক নিয়ামতুল্লাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তাঁর এতটুকুও সময় লাগেনি।

আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত নিসার আলী একটানা লেখা-পড়ার ভেতর সময় কাটান।

অর্থাৎ তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সময়-কাল ছিল আঠারো বছর। এই আঠারো বছর শিক্ষা জীবনে নিসার আলী নিজেকে ধাপে ধাপে যোগ্য করে গড়ে তুলেছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন আর দশজনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ করে।

তিনি তাঁর এই শিক্ষা জীবনেই কুরআনে হাফেজ হয়েছিলেন। তাছাড়াও আরবী ব্যাকরণ, ফারায়েজ, হাদীস, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, তাসাউফ, আরবী-ফারসী কাব্য ও সাহিত্যে তিনি বিশেষভাবে দক্ষতা অর্জন করে ছিলেন। সেই সাথে যুক্ত হয়েছিল তাঁর বাংলাভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য।

এসব ভাষায় নিসার আলী এতোটাই যোগ্যতা এবং দক্ষতা অর্জন করেছিলেন যে তিনি আরবী, ফারসী, উর্দু, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিতেও পারতেন।

লেখা-পড়ার ফাঁকে ফাঁকে প্রিয় শিক্ষক হাফেজ নিয়ামতুল্লাহর সাথে নিসার

আলী বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করতেন। সেই সময়ে তিনি ভ্রমণ করেছেন বাংলার বাইরে— বিহার শরীফ এবং তার আশ-পাশের বেশ কয়েকটি দেশ। এই ভ্রমণের ফলে নিসার আলী অর্জন করেন ব্যাপক বাস্তব অভিজ্ঞতা। যে অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর শিক্ষা জীবনের আর একটি উজ্জ্বল অধ্যায়।

নিসার আলীর শিক্ষা জীবন ছিল খুবই বর্ণাঢ্য। যেমন বর্ণাঢ্য ছিল তাঁর পরবর্তী জীবন-সংগ্রামের অম্লান ইতিহাস।

বিবাহ

সফলতার সাথে শিক্ষা জীবন শেষ করার পর নিসার আলী বিয়ে করেন।

তিনি বিয়ে করেন সেই সময়ের আর এক খান্দানী পরিবারে। এই পরিবারটি ছিল পূর্ব থেকেই আলেম, দীনদার এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত পরিবার। দীনের চর্চা ছিল তাদের পারিবারিক বৈশিষ্ট্য।

এই খান্দানী পরিবারে একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন। তিনি দরবেশ এবং বুজর্গ হিসাবেও অত্যন্ত পরিচিত ছিলেন। নাম— শাহ সুফী মুহাম্মদ আসমত উল্লাহ সিদ্দিকী।

দরবেশ আসমত উল্লাহর ছিল এক ছেলে। নাম— শাহ সুফী মুহাম্মদ রহীমুল্লাহ। তিনিও ছিলেন আলেম। তিনিও দরবেশ এবং বুজর্গ ব্যক্তি হিসাবে সমাজে পরিচিত ছিলেন।

নিসার আলী বিয়ে করেন এই দরবেশ পরিবারে। তাঁর স্ত্রীর নাম— মায়মুনা সিদ্দিকা।

মায়মুনা সিদ্দিকা ছিলেন শাহসুফী মুহাম্মদ আসমত উল্লাহ সিদ্দিকীর পৌত্রী এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ সুফী মুহাম্মদ রহীমুল্লাহ সিদ্দিকীর আদরের কন্যা।

মায়মুনা সিদ্দিকাও ছিলেন দাদা এবং পিতার সুযোগ্যা উত্তরসূরী।

তাঁর দাদা এবং পিতা ন্যায়নিষ্ঠ, দরবেশ ও ইসলামের খাদেম হবার কারণে তাঁদের গোটা পরিবারটি ছিল ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত।

পরিবারের সেই আদর্শ এবং ঐতিহ্য ছিল মায়মুনা সিদ্দিকার ব্যক্তিগত জীবনেও।

তিনিও ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ও পর্দানশীন। ছিলেন আচার-ব্যবহারে মার্জিত এবং শালীন।

এক খান্দানী পরিবার থেকে আর এক খান্দানী পরিবারে আসার কারণে মায়মুনা সিদ্দিকা দারুণ খুশি হলেন। খুশি হলেন নিসার আলীর মতো এক সচ্চরিত্র এবং আদর্শবান শিক্ষিত যুবকের সাথে বিয়ে হবার কারণে।

যুবক নিসার আলীর হৃদয়েও বয়ে গেল আনন্দের তুফান। মায়মুনার মতো একটি মেয়েকেই যেন তাঁর পরিবার খোঁজ করছিলেন। খোঁজ করছিলেন নিসার আলীর জীবন সঙ্গিনী করার জন্যে।

হাসান আলীর গোটা পরিবারে ছড়িয়ে পড়লো খুশির বন্যা।

এক দরবেশ পরিবারের কন্যা মায়মুনা সিদ্দিকাকে নিসার আলীর স্ত্রী হিসাবে ঘরে আনার কারণে খুশি হলেন মা রোকাইয়া। খুশি হলেন ছোট দাদা—সাইয়েদ ওমর দারাজ রাজীসহ সকলেই।

নিসার আলীর পরিবারে তখনো চলছে বিয়ের আনন্দে মৌ-মৌ উৎসব। চলছে খুশির উল্লাস।

ঠিক এমনি সময়ে ঘটে গেল একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা।

শোকের নদী

নিসার আলীর বিয়ের মাত্র চৌদ্দ দিন পর। তখনি ঘটে গেল দুঃখজনক ঘটনাটি।

নিসার আলীর ছোট দাদা সাইয়েদ ওমর দারাজ রাজী হঠাৎ করে ইন্তিকাল করলেন।

চলে গেলেন একটি নক্ষত্র। চলে গেলেন আপনজন এবং প্রিয়জনদেরকে অকূল শোক-সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে। চলে গেলেন তিনি পরপারে। আর এক অনন্ত জীবনে।

ছোট দাদার ইন্তিকালে তখনো গোটা পরিবার শোকে মুহ্যমান। তখনো তাঁদের বুকে কেঁপে কেঁপে উঠছে বেদনার বিশাল ঢেউ।

ঠিক এমনি সময়ে।—

ছোট দাদার ইন্তিকালের মাত্র ছয় মাস পরে। ঘটে গেল আর একটি মস্ত বড়ো দুর্ঘটনা।

আকস্মিকভাবে ইন্তিকাল করলেন— পিতা হাসান আলী।

একটি শোকের আগুন নিভতে না নিভতেই জ্বলে উঠলো আর একটি কষ্টের দাবানল।

হাসান আলীও ছিলেন একজন ইসলামের নিবেদিত খাদেম। ছিলেন দরবেশ সমতুল্য।

নিসার আলীর জন্মের আগেই ইন্তিকাল করেন তাঁর আপন দাদা সাইয়েদ শাহ্ কদম রসূল।

দাদার ছোট ভাই ওমর দারাজ রাজীর হাতেই মুরীদ হন নিসার আলীর পিতা—হাসান আলী।

হাসান আলী ছিলেন চাঁদপুর গ্রামের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁর পরিচিতি ছিল

গ্রামের বাইরে আরও দু-দশ গ্রাম ব্যাপী। ইসলাম প্রচার-প্রসারের জন্য তাঁর অবদান ছিল অনেক। সমাজ সেবক হিসাবেও ততোধিক খ্যাতি ছিল হাসান আলীর।

এই প্রাণপ্রিয় পিতার ইন্তিকালে যেমন নিসার আলী ব্যথিত হলেন, তেমনি ব্যথিত হলেন মা রোকাইয়া, স্ত্রী মায়মুনা, গোটা পরিবার এবং চাঁদপুরসহ আশ-পাশের সকল মানুষ। তাঁদের হৃদয়ের দুকূল ছাপিয়ে উঠলো বেদনার তুফান।

আখড়ার দলনেতা

সতেরো শো বিরাশি সাল। নিসার আলীর জন্মের সাল। সেই সময়ে বাংলার কিশোর-যুবকরা খেলা-ধুলার পাশাপাশি নিয়মিত শরীর চর্চা করতো।

তাদের শরীর চর্চার জন্যে ছিল বিভিন্ন আখড়া বা কেন্দ্র।

সেসব আখড়ায় শরীরচর্চা শিক্ষা দেবার জন্যে থাকতেন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক। তাঁরা সেইসব কিশোর-যুবককে ব্যায়ামসহ শরীরচর্চার বিভিন্ন কলা-কৌশল শেখাতেন। কিশোর যুবকরাও শিখতো অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে। গভীর মমতার সাথে।

নিসার আলীর পিতা হাসান আলীর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার নিয়মটি ছিল বেশ কড়া। যেমন ছিল সেখানকার লেখাপড়ার উন্নত পদ্ধতি, তেমনি ছিল অন্যান্য বিষয়েও অনেক নিয়ম-কানুন।

মাদ্রাসার প্রাঙ্গণটি ছিল সেই সময় শরীরচর্চার একটি নামকরা আখড়া।

এই আখড়ায় যুবকদেরকে শিক্ষা দেয়া হতো ডন-কুস্তী, হাডুডু, লাঠি খেলা, ঢাল শড়কী খেলা, তরবারি ভাঁজা, তীর গুলতী, বাঁশের বন্দুক চালনা প্রভৃতি।

ছেলেদের এসব শেখাবার জন্যে নিযুক্ত করা হলো একজন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক। তাঁর নাম মুহাম্মদ হানিফ। তাঁর বাড়ি ছিল চাঁদপুর গ্রামের পাশের গ্রাম— হায়দারপুর।

শরীরচর্চা সহ নানান বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে হানিফের নামডাক ছিল দুচার গ্রামব্যাপী। তাঁকে একনামে সবাই চিনতো।

মুহাম্মদ হানিফ নিজেও ছিলেন একজন যোগ্য খেলোয়াড়। এই সকল বিষয়ে ছিল তাঁর দারুণ দক্ষতা।

এই আখড়ায় একদিন ভর্তি হলেন এক যুবক। তিনি আর কেউ নন— নিসার

আলী তিতুমীর।

অন্যান্য যুবকদের সাথে নিসার আলীও শরীর চর্চা শিক্ষায় অংশ নেন। অংশ নেন খেলাধুলাসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণেও।

নিসার আলীদের শরীরচর্চা আখড়ায় আর একজন যোগ্য প্রশিক্ষক ছিলেন। তাঁর নাম— হাফেজ নিয়ামতুল্লাহ।

তিনি ছিলেন ঐ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক। ছিলেন কুরআন, হাদীস, আরবী এবং ফারসীর একজন নামকরা উস্তাদ।

আশ্চর্যের ব্যাপারই বটে!

হাফেজ নিয়ামতুল্লাহ কেবল একজন মাদ্রাসা শিক্ষকই ছিলেন না। তাঁর ছিল আরও অনেক গুণ। ছিল শিক্ষকতার বাইরেও অনেক যোগ্যতা।

এইসব যোগ্যতার মধ্যে অন্যতম ছিল বিভিন্ন খেলাধুলা এবং শরীরচর্চা।

লেখাপড়ার ফাঁকে কিংবা অবসরে হাফেজ নিয়ামতুল্লাহ তাঁর ছাত্রদেরকে নানাবিধ খেলার কসরতও শিক্ষা দিতেন।

প্রতিদিন ভোরে এবং সন্ধ্যা-রাত্রিতে তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে শরীরচর্চার পাশাপাশি অস্ত্রচালনার নানা প্রকার কলাকৌশলও শেখাতেন।

হাফেজ নিয়ামতুল্লাহ তাঁর ছাত্রদেরকে কেন অস্ত্র চালনা শেখাতেন? কি কারণ ছিল তাঁর এই প্রশিক্ষণের পেছনে?

নিশ্চয় কারণ ছিল। মস্ত বড়ো এক কারণ।

সেই কারণটি হলো— বাংলার মানুষ তখন একদিকে স্থানীয় হিন্দু জমিদারদের দ্বারা আক্রান্ত ছিল। অপরদিকে ইংরেজদের শোষণ আর উৎপীড়নে তারা ছিল জর্জরিত।

হাফেজ নিয়ামতুল্লাহ ছিলেন খুব সচেতন পণ্ডিত। তিনি জানতেন, বাংলার মানুষকে যদি এই অত্যাচার আর শোষণ থেকে মুক্ত করতে হয়, তাহলে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন অনিবার্য। আর সেই সশস্ত্র সংগ্রামের পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে সেইভাবে যোগ্য করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

হাফেজ নিয়ামতুল্লাহর এই প্রশিক্ষণ দান সম্পর্কে যেন কোনো রকম ভুল ধারণা না জন্মে, সেই জন্যে এখানে তখনকার পরিবেশ সম্পর্কে মাত্র এতোটুকুই উল্লেখ করা হলো।

ইংরেজদের অত্যাচারের কথা আমরা আর একটু পরে বিস্তারিতভাবে জানবার চেষ্টা করবো।

এখন আবার ফিরে যাই সেই আখড়ার কথায়। ফিরে যাই শরীরচর্চা সহ সেইসব খেলার প্রশিক্ষণের কথায়।

মাদ্রাসার সেই শরীরচর্চা আখড়ায় নিসার আলী নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিতেন।

ধীরে ধীরে তিনি আখড়ার একজন শ্রেষ্ঠ ছাত্রে পরিণত হলেন।

শুধু শ্রেষ্ঠই নন। কালে কালে তিনিই হয়ে উঠলেন আখড়ার ছাত্রদের মধ্যে দলনেতা বা সর্দার।

কলকাতার দিকে

বিয়ের দেড় বছর পর।

প্রিয় শিক্ষক হাফেজ নিয়ামতুল্লাহ্ একদিন নিসার আলীকে বললেন, আমি কলকাতা যাবো। তুমিও আমার সাথে যেতে পারো।

নিসার আলী তাঁর শিক্ষক নিয়ামতুল্লাহ্র সাথে ছায়ার মতো চলতেন। হাফেজ সাহেবও তাঁর প্রিয় ছাত্রটিকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। দুজনের মধ্যে মিল ছিল দারুণ। ছিল সখ্যতা। ছিল শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার এক অসামান্য পর্বত।

হাফেজ সাহেবের কলকাতা যাবার কথা শুনে মুহূর্তেই রাজি হয়ে গেলেন নিসার আলী। তাঁর হৃদয়ে তখন দেশ ভ্রমণের এক উত্তাল তরঙ্গ কেবলই দুলে দুলে উঠছে। দুলে উঠছে নতুন নতুন দেশ ভ্রমণ এবং নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের এক দুর্বার স্বপ্ন।

নিসার আলী তাঁর শিক্ষককে বললেন, জ্বী। আমি আপনার সাথে কলকাতা যেতে চাই। আমাকে সাথে করে নিলে আমি খুব খুশি হবো।

হাফেজ সাহেবও খুশি হলেন নিসার আলীর কথায়।

তাঁরা দুজনে একদিন যাত্রা করলেন কলকাতার দিকে।

হাফেজ সাহেব নিসার আলীকে সাথে নিয়ে পৌঁছলেন কলকাতার তালিব টোলায়। জায়গাটির বর্তমান নাম তালতলা।

তালতলায় বাস করতেন একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। তাঁর নাম মুহাম্মদ ইসরাইল। তিনিও ছিলেন কুরআনে হাফেজ। তাঁর আদি নিবাস ছিল হাফেজ নিয়ামতুল্লাহ্র মতো— বিহার শরীফে।

সেই সূত্রেই তাঁর সাথে পরিচয় ছিল নিয়ামতুল্লাহ্ সাহেবের।

তালতলা পৌঁছে হাফেজ সাহেব তাঁর ছাত্রকে নিয়ে ওঠেন সেই পূর্ব পরিচিত

বন্ধু— হাফেজ মুহাম্মদ ইসরাইলের বাসায়।

হাফেজ ইসরাইল বিহার শরীফ থেকে তালতলায় আসেন বেশ আগে। তিনি তালতলা জামে মসজিদের পেশ ইমাম নিযুক্ত হন। এখানে বিয়ে করে তিনি ঘর সংসার করতে থাকেন। এভাবে হাফেজ ইসরাইল কলকাতার অধিবাসী হয়ে যান।

তালিব টোলা বা তালতলার একটি অংশকে বলা হতো মিসরী গঞ্জ।

মিসরী গঞ্জে ছিল কুস্তি প্রতিযোগিতার একটি মস্ত বড়ো আখড়া। আখড়াটির নাম ডাক ছিল খুব।

এই আখড়ায় প্রায়ই কুস্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। চারপাশ থেকে ছুটে আসতো হাজারে হাজার মানুষ। তারা উপভোগ করতো সেই প্রতিযোগিতা।

তালতলার এই নামকরা আখড়াটির সভাপতি ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। নাম— জালাল উদ্দীন আফেন্দী।

নিসার আলী তালতলায় অবস্থান কালে যুক্ত হয়ে পড়েন এই আখড়ার সাথে। যুক্ত হয়ে যান আখড়ার রোমাঞ্চকর কুস্তি প্রতিযোগিতায়।

কুস্তিগীর হিসাবে মুহূর্তেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো নিসার আলীর নাম।

কুস্তিগীর নিসার আলী

নিসার আলী তাঁর নিজগ্রাম চাঁদপুরে থাকতেই কুস্তিখেলায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

কলকাতার তালতলায় আসার পর তিনি যোগ দেন কুস্তির আখড়ায়। যোগ দেন জালাল উদ্দীন আফেন্দী পরিচালিত সেই বিখ্যাত কুস্তি প্রতিযোগিতার কেন্দ্রে।

অন্যান্যদের সাথে আখড়ায় নিয়মিত যেতেন নিসার আলী। নিয়মিত চর্চা করতেন কুস্তি খেলার।

সে যুগে তখনো পেশাদার কুস্তি প্রতিযোগিতার প্রচলন হয়নি।

যারা ধনবান— তাঁরা শারীরিক শক্তি আর বীরত্ব অর্জনে প্রেরণা দেবার জন্যে বিজয়ী ব্যক্তিকে পুরস্কার ও খেলাত দান করতেন। আর পরাজিত ব্যক্তিকে দিতেন শুধু পুরস্কার।

তখনকার কুস্তি প্রতিযোগিতার এটাই ছিল অনেকটা নিয়মের মতো।

আর যারা কুস্তি লড়তেন— তারাও ধন-সম্পদের আশায় লড়তেন না। লড়তেন সম্মান এবং মর্যাদার জন্যেই। খেলাটি তাঁদের পেশা ছিল না। ছিল বীরত্বের নেশা। মনের আনন্দে তাঁরা এই বীরত্বপূর্ণ খেলায় অংশ নিতেন।

নিসার আলীও তাই করতেন।

নিয়মিত শরীর চর্চার ফলে নিসার আলীর দেহটাও হয়ে উঠেছিল মজবুত। শৈশবে যে ছেলেটি ছিলেন রোগাটে। যিনি ছিলেন খিটখিটে মেজাজের। বয়সকালে তিনিই হয়ে উঠলেন— একজন সেরা কুস্তিগীর।

চাঁদপুরে থাকতেই নিসার আলী স্থানীয় কুস্তির আখড়ায় বিভিন্ন সময়ের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন। অংশ নিতেন এবং বিজয়ী হতেন। তাঁর গ্রামে বিজয়ী পাহলোয়ানকে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কার দেয়া হতো। তিনিও অনেক

বার পেয়েছেন এসব পুরস্কার।

নিসার আলী চাঁদপুরের একজন সেরা কুস্তিগীর হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

সেই বিখ্যাত কুস্তিগীর নিসার আলী তালতলায় এলেও তাঁর পূর্বের নাম অক্ষুণ্ন রাখলেন। বিজয়ী হলেন অনেক কুস্তি প্রতিযোগিতায়। এভাবে অল্প কিছু দিনের মধ্যে তালতলা সহ্ কলকাতায় ছড়িয়ে পড়লো সেরা কুস্তিগীর নিসার আলীর নাম।

ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে সূর্যের কিরণের মতো নিসার আলীর শ্রেষ্ঠত্বের উজ্জ্বল রোদ্দুর।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

সবাই তাঁর বিজয়ে বাহবা দিলেও যেন সম্পূর্ণ তৃপ্ত হতো না নিসার আলীর হৃদয়ের গভীর সমুদ্র। সেই সমুদ্রে যেন লাফিয়ে উঠতো এক অজানা তুফান।

কিসের তুফান?

কি সেই অব্যক্ত স্বপ্ন?

কোন্ সেই নতুন আর এক জগতের দিকে কেবলই টানতো নিসার আলীর হৃদয়-মন?

আমরা এখন সেই রহস্যের ভেতরই প্রবেশ করবো।

আলোর খোঁজে উথাল-পাথাল

মিসরী গঞ্জের কুস্তি প্রতিযোগিতার তখন অনেক নামডাক। অনেক সেটার ভক্ত-অনুরাগী।

এই অনুরাগী আর উৎসাহীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হাফেজ নিয়ামতুল্লাহ, হাফেজ মুহাম্মদ ইসরাইল এবং মির্জা গোলাম আম্বিয়া।

মির্জা গোলাম আম্বিয়া ছিলেন শাহী খান্দানের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।

তিনি নিজে ছিলেন একজন মস্ত বড়ো জমিদার।

কিন্তু এতো বড়ো জমিদার হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁর কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না।

ছেলেমেয়ে না থাকার কারণে গোলাম আম্বিয়ার মনে যে আদৌ কোনো কষ্টের মেঘ জমতো না, তা নয়। জমতো বটে। কিন্তু মুহূর্তেই তিনি সেই কষ্টের মেঘকে দূরে ঠেলে দিতেন আর এক আনন্দের কোমল বাতাসে।

সেই কোমল বাতাসের নাম— দান-সাদকা এবং সৎ কাজে ব্যয়।

জমিদার হবার কারণে গোলাম আম্বিয়া ছিলেন অনেক ধন-সম্পদের মালিক। জমিদারী থেকে তাঁর আয় হতো প্রচুর অর্থ।

কিন্তু তিনি কৃপণ বা কঞ্জুস ছিলেন না। তিনি ছিলেন উদার মানুষ। বিশাল জমিদারী থেকে উপার্জিত সকল অর্থই তিনি ব্যয় করতেন সৎ কাজে।

ভালো কাজে ব্যয় করার আনন্দই আলাদা। এতে তৃপ্ত হয় হৃদয়। শীতল হয় মনের চাতাল। ভুলে থাকা যায় যাবতীয় দুঃখ-বেদনা।

গোলাম আম্বিয়া নিজেও ছিলেন একজন সৎ মানুষ। প্রজা বৎসল। সততা, মানবিকতা এবং উদারতা ছিল তাঁর উজ্জ্বল ভূষণ। দুহাতে ব্যয় করতেন তিনি সকল ভাল কাজে। অকাতরে। এতো বড়ো জমিদার হয়েও তাঁর মনে ছিলনা এতোটুকু অহংকার। ছিল না গর্বের এতোটুকু ধুলোকণা। এই কারণে সেই

সময়ে মির্জা গোলাম আম্বিয়ার নামটি ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর খ্যাতির সুবাতাস।

তখনো ভারত ভাগ হয়নি।

ভারত ভাগ হবার আগেও কলকাতা শহরের মির্জাপুর আমহার্স্ট স্ট্রীট অঞ্চলে ছিল গোলাম আম্বিয়ার বিশাল জমিদার বাড়িটি।

তাঁর বাড়ির নাম ছিল— 'মির্জা মঞ্জিল'।

মির্জা গোলাম আম্বিয়া এতোই বিখ্যাত ও নামকরা জমিদার ছিলেন, যার কারণে তাঁর নামানুসারে নামকরণ করা হয়— 'মির্জাপুর স্ট্রীট'।

মির্জা মঞ্জিলের দক্ষিণে ছিল মির্জা তালাব ও মির্জাবাগ।

এই মির্জাবাগও পরে 'মির্জাপুর পার্ক' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

জমিদার মির্জা গোলাম আম্বিয়ার যেখানে খান্দানী বৈঠকখানাটি ছিল, সেটারও পরে 'বৈঠকখানা রোড' নাম দেয়া হয়।

মির্জা গোলাম আম্বিয়া ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত পরহেজগার ব্যক্তি। জমিদার হয়েও তিনি ছিলেন সরল সহজ। অনাড়ম্বর ছিল তাঁর জীবন যাপন।

তিনি সাধারণ জীবন যাপন করতেন। সব সময় মশগুল থাকতেন আল্লাহর ইবাদাতে। মশগুল থাকতেন ইসলামের খেদমতে।

এই নির্লোভ এবং আল্লাহ-প্রেমিক অসামান্য পরহেজগার জমিদার ব্যক্তিটি সব সময় আল্লাহকে রাজি-খুশি রাখার চেষ্টা করতেন।

আল্লাহকে রাজি-খুশির জন্যেই তিনি বৃদ্ধ বয়সে তাঁর 'মির্জাপুর' ও 'বৈঠকখানা রোডের' মির্জা তালাব, মির্জাবাগ প্রভৃতি এলাকার বিশাল সম্পত্তি দান করে দেন কলকাতা মিউনিসিপালে।

তারপর তাঁর অন্যান্য বিষয় সম্পত্তি বিক্রি করে তিনি যাত্রা করেন মক্কার পথে।

এই অসাধারণ এক আল্লাহ প্রেমিকের নাম মির্জা গোলাম আম্বিয়া।

পরহেজগার এবং আল্লাহ-প্রেমিক হলেও তিনি ছিলেন মিসরীগঞ্জ কুস্তি

প্রতিযোগিতা আখড়ার একজন উৎসাহী ও অনুরাগী ব্যক্তি।

নিসার আলী ছিলেন এই আখড়ার একজন নামকরা কুস্তিগীর।

কুস্তির আখড়াতেই মির্জা গোলাম আম্বিয়ার দৃষ্টির সীমায় পড়ে যান নিসার আলী।

গোলাম আম্বিয়া ক্রমশ কাছে টেনে নেন নিসার আলীকে। তাঁর উন্নত চরিত্র, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং মধুর আচরণে মুগ্ধ হয়ে যান মির্জা গোলাম আম্বিয়া। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি একান্ত আপন করে নেন নিসার আলীকে।

নিসার আলীও গোলাম আম্বিয়ার আচার-ব্যবহারে অভিভূত হয়ে যান। অবাক হয়ে যান তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং দীনদারী ও পরহেজগারীতে। পরিচিত হবার পর থেকে প্রায়ই নিসার আলী ছুটে যেতেন গোলাম আম্বিয়ার কাছে। ছুটে যেতেন তাঁর সান্নিধ্যে।

মূলত মির্জা গোলাম আম্বিয়ার সান্নিধ্যে এসে সম্পূর্ণ বদলে যায় নিসার আলীর ভেতরের সত্তা। বদলে যায় তাঁর আমূল হৃদয়। জেগে ওঠে তাঁর ভেতর ঈমানের আর এক মহান সাগর।

এই সময়ে নিসার আলীর ভেতরের মানুষটি ক্রমাগত ছুটতে থাকে। ছুটতে থাকে দ্রুত গতিতে আলোর খোঁজে।

তাঁর ইচ্ছা জাগে— একজন কামেল মুর্শিদের হাতে বাইয়াত হবার। কথাটি একদিন তিনি জানালেন মির্জা গোলাম আম্বিয়াকে।

গোলাম আম্বিয়া একজন সেরা কুস্তিগীরের এই কথায় একটুও বিস্মিত বা হতবাক হলেন না। বরং তিনি নিসার আলীর আমূল পরিবর্তনের জন্যে প্রাণ খুলে দোয়া করলেন। দোয়া করলেন খুশি মনে তাঁর সুপ্রিয় কুস্তিগীর নিসার আলীর জন্যে।

ঠিক এই সময়। —

এই সময়ে কলকাতার তালিব টোলায় এলেন বিখ্যাত দরবেশ— জাকী শাহ।

একদিন নিসার আলী হৃদয়ের অদম্য টানে ছুটে গেলেন দরবেশ জাকী শাহর

দরবারে। দরবেশকে জানালেন তিনি তাঁর একান্ত বাসনার কথা। জানালেন মুরীদ হিসাবে দরবেশের হাতে বাইয়াত হবার কথা।

নিসার আলীর মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকলেন দরবেশ জাকী শাহ্।

এভাবে অনেকক্ষণ।

মন দিয়ে শুনলেন এক সুঠামদেহী কুস্তিগীরের হৃদয়ের আকুতি। শুনলেন তাঁর একান্ত বাসনা এবং স্বপ্নের কথা।

দরবেশ জাকী শাহ তখনো দেখছেন নিসার আলীকে। দেখছেন তাঁর ভেতরের উজ্জ্বল সত্তাকে। দেখছেন নিসার আলীর ভবিষ্যত সম্ভাবনাকে।

দেখছেন আর ভাবছেন দরবেশ।

ভাবছেন— এই যুবক কোনো সাধারণ যুবক নয়। এর ভেতর আছে এক সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। আছে সম্ভাবনার এক বারুদ-স্ফুলিঙ্গ।

ধীরে ধীরে চোখ খুললেন দরবেশ জাকী শাহ্। মনোযোগী হলেন নিসার আলীর প্রতি। খুব শান্তভাবে বললেন দরবেশ ঃ পীরের সন্ধান চাও? ভালো কথা। কিন্তু বায়তুল্লাহ শরীফ যিয়ারত না করলে তুমি তোমার নিযুক্ত পীরের সন্ধান পাবে না কখনো।

দরবেশ জাকী শাহ্র কথায় ঝড় বয়ে গেল নিসার আলীর ভেতরে। তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। অস্থির হয়ে উঠলেন প্রকৃত পীরের সন্ধান লাভের জন্যে।

মক্কার পথে

দরবেশ জাকী-শাহর কথা খুব মন দিয়ে শুনলেন নিসার আলী।

তাঁর হৃদয়ে তখন উত্তাল তরঙ্গ। তিনি কেবলই ছুটছেন আলোর খোঁজে। কিন্তু কোথায় সেই আলো? কোথায় সেই মুর্শিদ? যিনি দেখাতে পারেন তাঁর গন্তব্যের মঞ্জিল?

নিসার আলী মুর্শিদের খোঁজে ঘুরে বেড়ান সমগ্র কলকাতা। ঘুরে বেড়ান ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল।

কিন্তু কোথাও পেলেন না তাঁর যোগ্য রাহবার। যোগ্য মুর্শিদ।

অবশেষে জাকী শাহর পরামর্শ গ্রহণ করলেন নিসার আলী।

স্থির করলেন— তিনি হজ্জ পালনের জন্যে মক্কায় যাবেন।

কিন্তু কিভাবে যাবেন?

ভাবছেন নিসার আলী।

সেই ভাবনারও দ্রুত অবসান ঘটলো।

একদিন তিনি রওয়ানা দিলেন মক্কার উদ্দেশ্যে।

সময়টা ছিল আঠারো শো তেইশ সাল।

নিসার আলীর বয়স তখন একচল্লিশ বছর।

মক্কায় পৌঁছার পর নিসার আলীর সাক্ষাৎ হয় আর এক সংগ্রামী পুরুষের সাথে।

তাঁর নাম— সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী।

বেরেলভী ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। তাঁর পরিচিতি ছিল অনেক-অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। দেশের বাইরে। বিদেশের মাটিতেও।

এই বিখ্যাত ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসার পর নিসার আলীর জীবনের মোড় ঘুরে গেল মুহূর্তেই।

তিনি হয়ে গেলেন তখন অন্য এক মানুষ।

মক্কাজীবনে

মক্কায় সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর সাথে পরিচিত হবার পর প্রশান্ত হলেন নিসার আলী।

সাইয়েদ আহমদ কে ছিলেন?

সেই কথাটি আগে একটু জানা যাক। কেনোনা এই বীর পুরুষের সাথে যুক্ত হয়ে আছে নিসার আলীর জীবন-সংগ্রামের সুমহান ইতিহাস।

সাইয়েদ আহমদ জন্মগ্রহণ করেন সতেরো শো ছিয়াত্তর সালে। আরবী সাল হিসাবে ছয়ই সফর। বারো শো এক হিজরী। জন্মস্থানের নাম—এলাহাবাদের রায় বেরেলী।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে সমগ্র ভারতে এক বিরাট সুসংগঠিত স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে ওঠে।

এটাকে জিহাদী আন্দোলনও বলা হয়।

আন্দোলনটি পরিচালিত হয়েছিল একমাত্র ভারতীয় জানবাজ সাহসী মুসলমানদের দ্বারাই।

এই জিহাদী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী।

নিসার আলী ছিলেন যেমনি মেধাসম্পন্ন তেমনি বুদ্ধিমান। তিনি সাইয়েদ আহমদের সাথে পরিচিত হবার পর থেকেই এই নির্ভীক সত্যের সৈনিককে চিনে ফেললেন।

সাইয়েদ আহমদের তাকওয়া এবং পরহেজগারও নিসার আলীকে মুগ্ধ করলো। মুগ্ধ করলো তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব। ক্রমশ তিনি পরিচিত হলেন সাইয়েদ আহমদের জেহাদী আন্দোলন সম্পর্কে।

এবং তারপর যাচাই বাছাই করে তিনি তাঁর যোগ্য মুর্শিদ হিসাবে সাইয়েদ আহমদের হাতে বাইয়াত করলেন।

সাইয়েদ আহমদ ছিলেন নিসার আলীর চেয়ে মাত্র ছয়বছরের বড়ো। তবুও তিনি তাঁর হাতেই বাইয়াত করলেন। সাইয়েদ আহমদের কাছে নিসার আলী বাইয়াত করার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করলেন যে, বয়সটাই আসল নয়। প্রকৃত ব্যাপার হলো— যোগ্যতা। যার যোগ্যতা আছে, তাঁকে শ্রদ্ধা করতে হবে।

নিসার আলীকে দেখার পর থেকে সাইয়েদ আহমদও তৃপ্তি বোধ করলেন।

তিনি গভীরভাবে দেখলেন নিসার আলীকে। তাঁর নতুন শিষ্যকে। দেখার পর তাঁর বুঝতে আর বাকী থাকলো না যে, এই শিষ্য খুব সাধারণ মানুষ নয়। এঁর ভেতর আছে সুপ্ত বারুদ। বুকে আছে পর্বতসমান আল্লাহ প্রেম। আর আছে এক সাগর দুর্বার সাহস।

ভাবলেন সাইয়েদ আহমদ। ভাবলেন, এঁকে জাগাতে পারলে হয়তোবা জেগে উঠবে একটি ঘুমন্ত জাতি। লাফিয়ে উঠবে অলসতার ভাঁজ ভেঙ্গে উত্তাল তরঙ্গ। জ্বলে উঠবে সংগ্রামের দীপ্ত আগুন।

ইংরেজদের শোষণ ও নির্যাতন থেকে দেশ এবং জাতিকে মুক্ত করার জন্যে তখনো সংগ্রাম করে যাচ্ছেন সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী।

তিনি সংগ্রাম করে যাচ্ছেন মুসলমানের স্বাধীনতা, ঈমান এবং তাদের অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্যে।

সাইয়েদ আহমদ তাঁর প্রিয় শিষ্যের চোখে-মুখে বিশ্বাসের ফুলকী জ্বলে উঠতে দেখলেন। দেখলেন— নিসার আলীর বুকের ভেতর গর্জনমুখর সমুদ্রকে।

তিনি আহবান জানালেন তাঁকে জিহাদী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে।

নিসার আলী খুব খুশি হলেন তাঁর মুর্শিদের প্রস্তাবে। তাঁর আহবানে তিনি সাড়া দিলেন।

এখান থেকে, সেই মক্কায় অবস্থান কালে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর জিহাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়লেন নিসার আলী।

ভ্রমণ

নিসার আলী ছিলেন অত্যন্ত ভ্রমণবিলাসী। দেশ ভ্রমণে তাঁর আনন্দ ছিল প্রচুর।

আনন্দ ছিল বিচিত্র দেশ ঘুরে ফিরে দেখায়।

আর আনন্দ ছিল সেসব দেশ থেকে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে।

কলকাতায় থাকতেও নিসার আলী তাঁর প্রিয় শিক্ষক হাফেজ নিয়ামতুল্লাহর সাথে বিহার শরীফসহ বিভিন্ন দেশ এবং জায়গা ভ্রমণ করেছিলেন।

মক্কায় এসেও পেলেন আর এক উস্তাদ সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীকে।

সাইয়েদ আহমদের নিত্যসঙ্গী ছিলেন নিসার আলী।

তাঁর সাহচর্যে থেকেই তিনি বিভিন্ন দেশ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান ভ্রমণ করেন। এসবের মধ্যে ছিল মক্কা, মদীনা, কূফা, কারবালা, দামেশক, ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ, পবিত্র স্থান এবং পবিত্র শহর।

তাঁর এই ভ্রমণের ফলে তিনি বিভিন্ন দেশ থেকে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

পরিচিত হন অনেক বুজর্গানে দীনের সাথে।

তাঁদের কাছ থেকে অর্জন করেন ইসলামের বাস্তব শিক্ষা।

তিনি ভ্রমণ কালে যিয়ারত করেন শহীদানদের কবর। সেখান থেকেও সঞ্চয় করেন সাহসের দৃপ্ত চেতনা। জিহাদের অনুপ্রেরণা।

হজ্জ শেষে, ভ্রমণ শেষে, একদিন দেশে ফেরার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন সাইয়েদ নিসার আলী।

কথাটি জানালেন তাঁর প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীকে।

নিসার আলীর ইচ্ছার কথা জেনে সাইয়েদ আহমদ খুশি হলেন। হেসে বললেন— হ্যাঁ। এবার আমাদের ফেরার পালা।

স্বদেশের পথে

নিসার আলীর শিক্ষা, যোগ্যতা এবং তাঁর আদর্শ ও আচরণে অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী। তিনি বুঝলেন, নিসার আলী তাঁর সামান্য কোনো মুরীদ নন। তিনি নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারেন নিসার আলীর ওপর। তাঁর এই বিশ্বাস থেকেই তিনি নিসার আলীর ওপর এক বিরাট গুরু দায়িত্ব তুলে দিলেন।

সেই দায়িত্বের নাম— সংস্কার এবং জিহাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব।

সাইয়েদ আহমদ নিসার আলীকে দায়িত্ব দেন বাংলাদেশের ধর্মীয় এবং সমাজ সংস্কারের।

দায়িত্ব দেন বাংলার শোষিত এবং লাঞ্ছিত জনগণকে জাগাবার।

সাইয়েদ আহমদের এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল— দেশকে ইংরেজ মুক্ত করা এবং যাবতীয় কুসংস্কার থেকে ইসলামকে হেফাজত করা।

সাইয়েদ আহমদ তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে সর্বদা উদ্বুদ্ধ করতেন এই আন্দোলনের ধারায়।

মক্কা থেকে ফেরার সময় সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী তাঁর খলীফা মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসমাইল ও মাওলানা ইসহাককে একটি নির্দেশ দেন। সাইয়েদ আহমদের সেই নির্দেশটি ছিল ঃ

"তোমরা আপন আপন বাড়ি পৌঁছে দিন পনেরো বিশ্রাম নেবে। তারপর তোমরা বেরেলী পৌঁছলে তোমাদের নিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থান সফর করবো। পাটনায় কয়েকদিন বিশ্রামের পর কলকাতা যাবো।"

আর বাংলাদেশের খলীফাদের প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল ঃ

"আমি পাটনায় পৌঁছে মাওলানা আবদুল বারী খাঁ (মাওলানা আকরম খাঁর পিতা), মাওলানা মুহাম্মদ হোসেন, মাওলানা হাজী শরীয়তুল্লাহ, মাওলানা

সাইয়েদ নিসার আলী, মাওলানা সূফী খোদাদাদ সিদ্দিকী ও মাওলানা কারামত আলীকে খবর দেব। আমার কলকাতা পৌঁছার দিন-তারিখ তোমরা তাদের কাছে জানতে পারবে। কলকাতায় আমাদের যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে তাতে আমাদের চূড়ান্ত কর্মসূচী গৃহীত হবে।"

সাইয়েদ আহমদের এই বিদায়ী ভাষণের পর তাঁরা সকলেই মক্কা থেকে স্বদেশের দিকে রওয়ানা দিলেন।

সাইয়েদ আহমদ ফিরে গেলেন পাঞ্জাবে।

আর নিসার আলী ফিরে এলেন বাংলায়। কলকাতার তালতলায়। তাঁর পূর্বের অবস্থানে।

সময়টা ছিল আঠারো শো সাতাশ সাল।

মক্কায় ছিলেন তিনি দীর্ঘ চার বছর।

দেশে ফিরে চমকে উঠলেন নিসার আলী। চমকে উঠলেন দেশের করুণ অবস্থা দেখে। শিউরে উঠলেন মানুষের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা আর শোষণ-নিপীড়নের করুণ চিত্র দেখে। অন্যদিকে আঁতকে উঠলেন নিসার আলী— ইংরেজ ও অত্যাচারী হিন্দু জমিদারদের পশুসুলভ আচরণে।

কেমন ছিল তখনকার বাংলার অবস্থা?

নিসার আলীর সংগ্রাম সম্পর্কে জানবার আগে বাংলার সেই করুণ চিত্রের দিকে একবার তাকানো যাক।

একটু আগের কথা

নিসার আলী এমন এক দুঃসময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বাংলার মুসলমানরা যখন ছিল একেবারে দিশাহারা।

ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের জালে আর তাদের কূটকৌশলের নাগপাশে তখন কম্পমান ছিল মুসলমানরা। শুধু মুসলমানই বা বলি কেন। তাদের হাত থেকে রক্ষা পেতনা নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও।

ইংরেজদের দোসর ও হাতের লাঠি ছিল এদেশের উচ্চ বর্ণের হিন্দু এবং জমিদাররা।

ষড়যন্ত্র এবং কূটকৌশলের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল।

সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে উড়ে আসা এই শ্বেত ভল্লুকেরা জুড়ে বসলো সবুজ-শ্যামল বাংলায়। এখানে তারা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলো তাদের অসহনীয় দুঃশাসন।

কিন্তু বাংলার জনগণ তাদের এই শাসন ও শোষণ কখনই মেনে নিতে পারেনি।

ইংরেজরা ছিল খুবই চতুর এবং ধূর্ত। তারাও খুব ভালভাবে জানতো একথা। আর জানতো বলেই তারা প্রথম দিকে সরাসরি ক্ষমতা প্রয়োগ না করে বেছে নিল মীর জাফরের মতো কিছু বিশ্বাসঘাতককে। তাদের মাধ্যমে ইংরেজরা ধাপে ধাপে এগিয়ে গেল।

লোভী মীরজাফরদের কারণে ইংরেজরা সহজেই বাংলার বুকে চেপে বসতে সাহসী হলো। ক্রমে তাদের শাসন আর শোষণে নিষ্পেষিত হলো সাধারণ জনগণ। তাদের অত্যাচার আর উৎপীড়নে, তাদের হত্যা আর লুণ্ঠনে বাংলার মানুষ ছিল দিশাহারা। মুহূর্তে তারা সম্পদ হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেল। হয়ে

গেল অসহায় বাস্তুহারা।

বাংলার ধনসম্পদ লুট করার মূল চাবিকাঠি নিজেদের হাতে রেখে দিত ইংরেজ কোম্পানী। তাদের কারণে ক্রমান্বয়ে বাংলার জনগণ হয়ে পড়লো পথের ভিখারী।

কিন্তু তাদের চাতুর্যে মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার কারণ হিসাবে মীর জাফরের মতো এদেশের কতিপয় লোভী ও বিশ্বাসঘাতকের মাথায় অপবাদটা একচেটিয়াভাবে চেপে বসলো।

আশ্চর্যের ব্যাপারই বটে!

ক্লাইভ এইসব অপকর্মের মূল নায়ক হয়েও তার চাতুর্যের কারণে সে থেকে গেল ভালো মানুষের কাতারে।

ছদ্মবেশী এই ধূর্ত ইংরেজের কারণে সেদিন নেমে এসেছিল বাংলার আকাশে দুর্যোগের মহা ঘনঘটা।

দেশ বিজয়ের সাথে লর্ড ক্লাইভ ও তার দোসররা বাংলার ওপর কায়েম করলো লুণ্ঠন ও অত্যাচারের এক ভয়াবহ বিভীষিকা।

সতেরো শো সাতান্ন সালে পলাশী যুদ্ধের পর মীর জাফরের কাছ থেকে উৎকোচ হিসাবে ক্লাইভ গ্রহণ করেছিল দু লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাউন্ড।

বাংলার এই বিপুল অর্থ লুটে নিয়ে ক্লাইভ রাতারাতি হয়ে গেল শ্রেষ্ঠ ধনী।

এখানেই শেষ নয়।

নবাবী লাভের ইনাম হিসাবে কোম্পানীর কর্মচারীরা মীর জাফরের কাছ থেকে আদায় করলো ত্রিশ লক্ষ পাউন্ড। সেই সাথে চব্বিশ পরগনা জিলার জমিদারীও।

সতেরো শো ছেষট্টি সালে বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত অনুসন্ধান কমিটি ইংরেজ কর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণের একটি তালিকা তৈরি করে। সেই তালিকায় দেখা যায়, সতেরো শো সাতান্ন সাল থেকে সতেরো শো ছেষট্টি সাল পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা বাংলা ও বিহার থেকে মোট নয় কোটি টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেছিল।

শোষণের করুণ চিত্র

বাংলা ও বিহারকে ইংরেজরা শোষণ করে ফেলেছিল। তাদের লোমহর্ষক শোষণে বাংলার মানুষ হয়ে উঠেছিল অতিষ্ঠ।

স্বয়ং লর্ড মেকলও ইংরেজদের শোষণ উৎপীড়নে শিউরে উঠেছিলেন। তিনিও একসময় মুখ খুলতে বাধ্য হলেন। তাঁর হৃদয়টাও ব্যথায় ভরে উঠলো। বাংলার সেই বীভৎস করুণ চিত্র সম্পর্কে লর্ড মেকল বলেন ঃ

"ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থে নয়, নিজেদের জন্যেই কোম্পানীর কর্মচারীরা এদেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ক্ষেত্রে নিজেদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। দেশীয় লোকদের তারা দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্য অল্প দামে বিক্রি এবং বৃটিশ পণ্যদ্রব্য বেশি দামে ক্রয় করতে বাধ্য করতো। কোম্পানীর আশ্রয়ে প্রতিপালিত দেশীয় কর্মচারীরা সমগ্র দেশে সৃষ্টি করেছিল শোষণ ও অত্যাচারের ভয়াবহ বিভীষিকা। কোম্পানীর প্রতিটি কর্মচারী ছিল তার প্রভুর (লর্ড ক্লাইভ) শক্তিতে শক্তিমান। আর এইসব প্রভুর শক্তির উৎস ছিল স্বয়ং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। কলকাতায় ধন-সম্পদের পাহাড় তৈরি হলো। অপর দিকে তিন কোটি মানুষ দুঃখ-দুর্দশার শেষ স্তরে উপনীত হলো। সত্য কথা যে, বাংলার মানুষ শোষণ-উৎপীড়ন সহ্য করতে অভ্যস্ত; কিন্তু এমন ভয়াবহ শোষণ-উৎপীড়ন তারা কোনোকালে দেখেনি"।

লর্ড মেকলের এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে, তখনকার বাংলার করুণ চিত্রটি ছিল কত বড় ভয়াবহ।

বাস্তুহারা কৃষক

ইংরেজদের সর্বগ্রাসী শোষণ-উৎপীড়নে বাংলার কৃষকরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। এই অত্যাচারীদের সাথে যোগ দিয়েছিল হিন্দু জমিদাররা। অনিবার্য ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়ালো মুসলিম পরিবার। বাংলার হতভাগ্য দরিদ্র কৃষক মানেই মুসলমান। আর জমিদার এবং বিত্তবান মানেই হিন্দু। এটা ছিল তখনকার দিনে অতি পরিচিত একটি সত্য।

ইংরেজ শাসনের আগে শাসকগণ রাজস্ব আদায় করতো। তারা রাজস্ব আদায় করতো গ্রাম-সমাজের কাছ থেকে। কোনো ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে নয়। কৃষক রাজস্ব দিতো তার উৎপাদিত ফসল দিয়ে।

কিন্তু অত্যাচারী ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানীর শাসকরা গ্রাম-সমাজের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের নিয়মটা বাতিল করে দিলো।

তারা কৃষকদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে রাজস্ব আদায়ের প্রথা চালু করলো। আর তাদের রাজস্ব আদায়ের গ্রহণযোগ্য মাধ্যম হয়ে গেল ফসলের পরিবর্তে মুদ্রা।

রাজস্ব আদায়ের জন্যে কৃষকরা এতো নগদ অর্থ সংগ্রহ করতে হিমশিম খেতো।

খাজনা বা রাজস্ব আদায়ের জন্যে চতুর ইংরেজরা নিয়োগ করলো বাংলার লোভী গোমস্তাদেরকে।

সর্বপ্রথমে তারা মোগল আমলের কিছু সংখ্যক জমিদার ও রাজস্ব আদায়কারী গোমস্তাদের জমির মালিক বলে ঘোষণা করলো।

যেখানে জমিদার বা গোমস্তা ছিল না, সেখানে জমির মালিক হিসাবে ঘোষিত হলো গ্রাম-সমাজের প্রধান বা সম্পদশালী ব্যক্তি।

পরবর্তীকালে এরাই জমিদার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে। তারা ছিল সবাই উচ্চ বর্ণের হিন্দু।

এই জমিদারদের প্রধান কাজ ছিল— কৃষকদেরকে শোষণ করা।

ইচ্ছা মতো যতো খুশি কৃষকদের কাছ থেকে তারা খাজনা আদায় করতো এবং তার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ রাজস্ব হিসাবে ইংরেজ সরকারের হাতে তুলে দিতো।

শুধু তাই নয়।

ইংরেজদের প্রত্যক্ষ মদদে পুষ্ট এই সব জমিদাররা তাদের ইচ্ছা মতো জমি বিক্রি, নতুন ভাবে জমি বণ্টন ও বন্ধক রাখার ক্ষমতাও হস্তগত করলো।

জমিদাররা জমির বিলি-ব্যবস্থার মারফত সৃষ্টি করলো তাদের সমর্থক গাঁতিদার, পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, তালুকদার নাম উপস্বত্বভোগী।

শোষক ও উৎপীড়কদের ভূমিকায় বাংলার কৃষকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো তারাও। চেপে বসলো কৃষকদের ঘাড়ের ওপর।

আর সবার ওপরে থাকলো মহা অত্যাচারী শোষক ইংরেজ বণিকরাজ।

ফসলের পরিবর্তে মুদ্রার মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের নিয়ম চালু হবার কারণে কৃষকদের মাথায় হাত উঠলো।

রাজস্ব আদায়ের জন্যে মুদ্রার প্রয়োজন। আর এই মুদ্রার জন্যে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের সিংহভাগ পানির দামে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হতো।

ইংরেজরা ছিল খুবই হিসাবী। তারা জানতো কৃষকদের এমন অবস্থা হবে। আর তাই ফসল কেনার জন্যে ইংরেজ বণিকরা বাংলা ও বিহারে কয়েকটি কেন্দ্র খুললো। সুযোগ বুঝে ইংরেজ বণিকরা কৃষকদের কাছ থেকে খুব কম দামে ফসল কিনতো। আর সেইসব কেনা ফসল নিয়ে তারা গুদামজাত করে রাখতো। পরে সময় সুযোগ বুঝে অধিক চড়াদামে তারা এগুলো বিক্রি করতো সেইসব কৃষকের কাছেই। কারণ ততোদিনে তারা শোষণে-শোষণে হত দরিদ্র হয়ে পড়েছিল।

ইংরেজদের এই ফসল গুদামজাত করার ফলে বাংলার কৃষক হয়ে পড়ল সর্বস্বান্ত। তারা হয়ে গেল সম্পদহারা ও গৃহহারা। আর এভাবেই এক সময় দেখা দিল বাংলার মাটিতে এক মহা দুর্ভিক্ষ।

সেই দুর্ভিক্ষের করুণ কাহিনীর কথা আমরা একটু পরে জানবো। তার আগে জেনে নিই তখনকার তাঁতীদের অবস্থা।

তাঁতীদের অবস্থা

নিম্নবিত্ত মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে তাঁতীরা ছিল সংখ্যার দিক থেকেও উল্লেখযোগ্য।

তাঁত শিল্প ছিল বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী একটি শিল্প। প্রত্যেক জিলায় তাঁত শিল্পের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। বাংলাদেশের তাঁত শিল্প এতোই সমৃদ্ধ ছিল যে এখানে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও সুরাট থেকে তুলা আমদানী করতে হতো।

দেশে তৈরি মোটা কাপড় দেশী মানুষেরা ব্যবহার করতো। আর ঢাকায় তৈরি সূক্ষ্ম মসলিন কাপড় রপ্তানী করা হতো ইউরোপের বিভিন্ন দেশে।

ঢাকার মসলিন ছিল পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাপড়। এই মসলিনের নাম ছিল বিশ্ব জোড়া।

তখনকার দিনে বাংলাদেশের তাঁতীদের ঘরে সুখ ছিল। সুখ ছিল তাদের হৃদয়েও।

কিন্তু তাঁতীদের এই সুখের সংসার বেশি দিন স্থায়ী হতে পারেনি। তাদের সুখের ঘরে অকস্মাৎ হানা দিল ইংরেজ দস্যুরা। ঈর্ষায় জ্বলে উঠলো তাদের বুক।

তাদের হিংস্র থাবা আছড়ে পড়লো তাঁতীদের ওপর।

ইংরেজ কোম্পানীদের ঈর্ষার কারণ হলো—মুসলমানরা কেন সুখে-শান্তিতে থাকবে? তারা সুখে থাকলে তো ইংরেজদের অনেক সমস্যা। সমস্যা হবে তাদেরকে গোলাম বানাতে। সমস্যা হবে তাদেরকে দাবিয়ে রাখতে।

সুতরাং ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীরা এদেশের তাঁতীদেরকে উচ্ছেদ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল।

নানাভাবে শুরু করলো তারা ষড়যন্ত্র।

দেশীয় তাঁতীদের এবং শিল্প কল-কারখানাকে অকেজো করার জন্যে তারা ইংল্যান্ড থেকে বিপুল পরিমাণ বস্ত্র আমদানী করতে থাকলো।

বিভিন্নভাবে তারা বাংলার তাঁতীদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেবার কূটকৌশল বাস্তবায়ন করলো।

এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম বোলেটর বলেন ঃ

"কোম্পানীর আমলের প্রথম দিকে তাঁতীদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়েছিল। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা তাদের আশ্রিত হিন্দু বেনিয়া এবং এদেশীয় গোমস্তাগণ প্রত্যেক তাঁতীকে নির্দিষ্ট দামে নির্দিষ্ট পরিমাণে কাপড় সরবরাহের জন্য বাধ্য করতো। কেউ অস্বীকার করলে তার কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হতো এবং চাবুক-পেটা করা হতো।

তাঁতীরা সব চাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়— যখন কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণ নির্দেশ দেন যে, তাঁতীরা শুধু কাঁচামাল এবং রেশম সরবরাহ করবে। তারা নিজেদের হাতে কোনো কাপড় বুনতে পারবে না।

তারা রেশম উৎপাদনকারীদেরকে নিজেদের তাঁত বন্ধ করে কোম্পানীর কারখানায় কাপড় বুনতে বাধ্য করে। ফলে এদেশের কাপড় রপ্তানীর পরিমাণ কমে যায়। . . . কোম্পানীর চাপের মুখে মসলিন কাপড়ের বুনন একেবারে বন্ধ হয়ে যায় এবং বঙ্গদেশের বস্ত্রশিল্পের সমৃদ্ধি লোপ পায়।"

এভাবে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইংরেজরা বাংলাদেশের তাঁতীদেরকে ভিক্ষুকে পরিণত করে দিল। তাদের সর্বগ্রাসী অত্যাচার আর শোষণে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল বাংলার তাঁতীরা।

কুঠিয়ালদের কুঠারাঘাত

নিসার আলীর সময়কালের আর এক ভয়ংকর বিভীষিকা ছিল কুঠিয়ালদের অত্যাচার।

বাংলাদেশের চাষীদের জন্যে তারা ছিল এক মহা আতংকের দাবানল। তারা ছিল মস্ত বড়ো এক অভিশাপ।

সমগ্র বাংলা ধ্বংস করার জন্যে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের আর একটি কৌশল ছিল নীলচাষ।

এদেশের কৃষকদেরকে তারা নীল চাষে বাধ্য করতো।

বাংলার মুসলিমপ্রধান জিলাগুলোতে কুঠিয়ালদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নীল চাষ করা হতো।

ইংরেজ কুঠিয়ালরা ছিল যেমন অত্যাচারী তেমনি শোষক।

তাদের জুলুমের কোনো শেষ ছিলনা। তারা একদিকে নীল চাষের জন্যে মুসলিম কৃষকদেরকে চাপ দিত অপর দিকে তারা সেই নীলের দাম দিতো খুবই কম। দেখা যেত নীল চাষ করতে কৃষকদের যে টাকা খরচ হতো, কুঠিয়ালরা সেই খরচের চেয়েও সাত/আট টাকা কম দামে তাদের কাছে বিক্রি করতে নীল চাষীদেরকে বাধ্য করতো।

অভাব আর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কুঠিয়ালরা মুসলিম গরীব চাষীদের স্বার্থ বিরোধী চুক্তিতে আবদ্ধ করতো। তাদের হালের বলদ এবং লাঙ্গল জোয়াল বন্ধক রেখে তারা নীল চাষের জন্যে টাকা লগ্নী করতো।

কেউ নীল চাষ করতে না চাইলে তাকে কয়েদখানায় বন্দী করা হতো। নির্মমভাবে বেত মেরে রক্তাক্ত করে দিত। কেউ নীল চাষের চুক্তিতে আবদ্ধ হতে না চাইলে তার ক্ষেতের রোয়া কিংবা পাকা ধান, আখ, রবিশস্য— সকল ফসল তারা উপড়ে ফেলতো। সম্পূর্ণ ভাবে তা নষ্ট করে দিত।

অনেক সময় হিন্দু জমিদাররা এইসব দুর্বল মুসলিম চাষীদেরকে জোর করে ধরে নিয়ে কুঠিয়ালদের হাতে তুলে দিত। আর কুঠিয়ালরা চাবুকের আঘাতে জর্জরিত করে দিত বাংলার অসহায় কৃষককে।

কুঠিয়ালদের প্ররোচনায় হিন্দু জমিদাররা মুসলিম চাষীদের সর্বস্ব লুট করার সুযোগ গ্রহণ করতো।

কুঠিয়ালদের এতো যে অত্যাচার আর জুলুম চলতো, কিন্তু বাংলার কৃষকদের অভিযোগ করার মতো কোনো জায়গা ছিল না। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কেন, টু-শব্দটিও করার কোনো উপায় ছিল না। এই কুঠিয়ালদের ভয়ে সব সময় সন্ত্রস্ত থাকতো বাংলার কৃষক। না জানি হিংস্র বাঘের মতো অতর্কিতে কখন ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের জীর্ণ-শীর্ণ দেহের ওপর।

থানার দারোগা, ম্যাজিস্ট্রেটরাও ছিল কুঠিয়ালদের আস্থাভাজন। প্রিয়পাত্র। তারাও কোনো পদক্ষেপ নিত না গরীবে অত্যাচারিত কৃষকদের পক্ষে।

ইংরেজ কুঠিয়ালরা ছিল আইনের উর্ধে। বিচারের নাগালের বাইরে।

আইন ও বিচারের উর্ধে থাকার কারণে কুঠিয়ালদের সাহস বেড়ে গিয়েছিল বহুগুণে। অত্যাচারের মাত্রাও বাড়িয়ে দিয়েছিল সেই পরিমাণ। কখনোবা পাড়া, মহল্লা এবং গোটা গ্রামকেই তারা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিত। দাউ দাউ আগুনে জ্বলে পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে যেত বিশাল জনপদ, ঘর-বাড়ি ফসলের ক্ষেত—সব কিছু।

একবার অত্যাচারী কুঠিয়ালরা একটি গ্রামে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

আবদুল গনি নামক এক দফাদার তাদের এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করায় কুঠিয়ালরা তাকে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করেছিল।

শারীরিক নির্যাতন চালিয়েও ক্ষান্ত হয়নি নরপশু কুঠিয়াল বাহিনী। তারা আবদুল গনিকে জোর করে ধরে নিয়ে চার মাস যাবত একটি অন্ধ কোঠায় আবদ্ধ করে রেখেছিল।

এভাবে কুঠিয়ালদের অত্যাচার আর শোষণে বাংলার কৃষকরা হয়ে গিয়েছিল অসহায় এবং নিঃস্ব। তাদের চাষের জমি হলো বেদখল। ফসল হলো

বেহাত। আর জীবন হয়ে উঠলো বিপন্ন।

বাংলার চাষীদের ওপর কুঠিয়ালদের শোষণ আর অত্যাচারের লোম হর্ষক দৃশ্যে ব্যথিত হয়ে স্বয়ং এশলে ইডেনও শিউরে উঠেছিলেন। ব্যথিত হৃদয়ে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন ঃ

"ইংল্যান্ডে এমন কোনো নীলের বাক্স পৌঁছায় না, যার মধ্যস্থিত নীলে বাংলাদেশের লোকের রক্ত মিশে থাকেনা। আর এই রক্ত হলো মুসলিম চাষী সম্প্রদায়ের রক্ত।"

মহা দুর্ভিক্ষের কবলে

কৃষক, তাঁতী, নীল চাষীসহ বাংলার মানুষের অবস্থা যখন খুবই শোচনীয়, তখনই ইংরেজরা তৈরি করলো সুপরিকল্পিত এক মহা দুর্ভিক্ষের নীল-নকশা।

বাংলা এগারো শো ছিয়াত্তর সালের কথা।

ইংরেজ কোম্পানী সরকার ফসলের পরিবর্তে মুদ্রায় খাজনা আদায়ের নিয়ম চালু করলো। তাদের খাজনা দেবার জন্যে চাষীকে ফসল বিক্রি করতে হতো। চাষীর ফসল মানেই তো খাদ্যশস্য।

একমাত্র মুখের গ্রাস— সেই খাদ্যশস্য বিক্রি করে চাষীকে খাজনার টাকা সংগ্রহ করতে হতো।

চাষীদের এই জীবন-মরণ সমস্যার মধ্যেই ইংরেজ বণিকরা মুনাফা লোটার আর একটি হাতিয়ার পেয়ে গেল। সুযোগ বুঝে তারা বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে খুলে বসলো ধান-চালের একচেটিয়া ব্যবসা কেন্দ্র।

চাষীরা খাজনা আদায়ের জন্যে বাধ্য হয়ে ধান-চাল বিক্রি করতো, আর তা অল্প দামে কিনে গুদামজাত করে রাখতো ইংরেজ ব্যবসায়ীরা। পরে সময় ও সুযোগ বুঝে আবার অধিক চড়া দামে বিক্রি করতো চাষীদের কাছেই।

পেটের দায়ে চাষীরা যখন স্বাভাবিক উপায়ে খাদ্যদ্রব্য কিনতে অক্ষম হয়ে পড়লো, তখন তারা বাধ্য হলো মহাজনদের কাছে যেতে। মহাজনদের কাছে এইসব নিঃস্ব চাষীরা তাদের ঘটিবাটি, ব্যবহার্য অন্যান্য জিনিসপত্র বন্ধক রেখে তার বিনিময়ে যে সামান্য টাকা পেতো তা দিয়েই কিনতো চড়া দামের ধান-চাল, খাদ্য শস্য।

চাষীদের উৎপপাদিত ফসল চাষীদেরই কিনতে হয় অধিক দামে! যে ফসল ফলাতে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়তো, সেই ফসলই আবার খাজনা আদায়ের

জন্যে বিক্রি করে দিতে হতো পানির দামে! এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে?

কিন্তু কিছুতেই তাদের পেটের ভাতের সংস্থান হতো না।

মহাজনদের ঘরে তাদের ঘটিবাটি জমি জায়গা— একে একে সবই গেল। তাতেও শেষ রক্ষা হলো না।

চাষীদের ঘরে ঘরে জ্বলে উঠলো অভাবের তীব্র আগুন। তাদের হাহাকারে ভারী হয়ে উঠলো বাংলার আকাশ। কিন্তু তবুও ইংরেজ বণিকদের পাষণ্ড হৃদয় এতোটুকুও কেঁদে উঠলো না। ধান-চালের গুদামে তারা তালা ঝুলিয়ে পা দুলাতে থাকলো। আর দেখতে থাকলো বাংলার মানুষের বুকফাটা আহাজারী। ক্ষুধার্ত শিশুদের গগন বিদারী চিৎকার।

নেমে এলো এক মহা দুর্ভিক্ষ।

ভয়ংকর এক মৃত্যুর ছোবল!

ক্ষুধার তীব্র দাহনিকায় ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো বাংলার কোটি কোটি মানুষ।

ইংরেজদের সৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষটি 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামেই ইতিহাসখ্যাত।

কোম্পানী সরকারের চাকুরী নীতিতে ছিল আর এক মারাত্মক ধোঁকা।

তাদের চাকুরীনীতি, শিক্ষানীতি ও বিভেদ নীতির ফলেই মুসলিম জনসাধারণ এক চরম দুর্দশা ও অভাবের মধ্যে কাল যাপন করছিল। তার ওপর এই দুর্ভিক্ষ ! গ্রামের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ মানুষ কৃষিজীবী। তাদের অধিকাংশই হতভাগ্য মুসলমান।

দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে এই দরিদ্র মুসলমানদের সেদিন মরা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

সেই দুর্ভিক্ষ এতোই ভয়াবহ ছিল যে, ইংরেজ লেখক মিঃ হান্টারও সেদিন শিউরে উঠেছিলেন। তিনি এই দুর্ভিক্ষের করুণ পরিণতি সম্পর্কে বলেন ঃ

"১৭৭০ সালের সারা গ্রীষ্মকাল ব্যাপী লোক মারা গেছে। কৃষকেরা তাদের গরু-বাছুর, লাংগল-জোয়াল বেচে ফেলেছে এবং বীজধান খেয়ে ফেলেছে।

অবশেষে তারা ছেলে-মেয়ে বেচতে শুরু করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একসময় আর ক্রেতাও পাওয়া গেলনা। তারপর তারা গাছের পাতা আর ঘাস খেতে শুরু করলো। ১৭৭০ সালের জুন মাসে কোম্পানীর রেসিডেন্ট স্বীকার করেন যে, জীবিত মানুষ মরা মানুষের গোশত খেতে শুরু করে। অনশনে শীর্ণ, রোগক্লিষ্ট কঙ্কালসার মানুষ দিনরাত সারি বেঁধে বড় বড় শহরে জমা হতো। বছরের গোড়াতেই সংক্রামক রোগ শুরু হয়েছিল। মার্চ মাসে মুর্শিদাবাদে পানিবসন্ত দেখা দেয় এবং বহু লোক এ রোগে মারা যায়। মৃত ও মরণাপন্ন রোগী স্তূপাকার হয়ে পড়ে থাকায় রাস্তাঘাটে চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়ে। লাশের সংখ্যা এতো বেশি ছিল যে, তা পুঁতে ফেলার কাজও দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। প্রাচ্যের মেথর, শিয়াল ও শকুনের পক্ষেও এতো লাশ নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব ছিল না। ফলে দুর্গন্ধযুক্ত গলিত লাশ মানুষের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল।"

সেই সময়ের বিখ্যাত ইতিহাস— "সিয়ারে মুতাখ্খারীন"-এর রচয়িতা ইংরেজ দস্যু ও তার দেশীয় দালালদের শোষণ-উৎপীড়ন এবং তাদেরই সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে কোটি কোটি মানুষের দুঃখ-দুর্দশা আর মৃত্যু যন্ত্রণার দৃশ্যে উদ্বিগ্ন ও ব্যথিত হয়ে লিখেছিলেন ঃ

"হে খোদা, তোমার দুর্দশাগ্রস্ত বান্দাদের সাহায্যের জন্যে একটিবার তুমি ধরাপৃষ্ঠে নেমে এসো। এই অসহনীয় উৎপীড়ন আর দুর্দশা থেকে তাদেরকে রক্ষা করো"।

এই দুর্ভিক্ষে বাংলার কতো মানুষ যে মারা গিয়েছিল, তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। তবে কিছুটা অনুমান করা যায় হান্টারের উক্তিতে। তিনি বলেন ঃ

"সরকারী হিসাবে ১৭৭০ সালের মে মাস শেষ হবার আগেই জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ শেষ হয়ে গিয়েছিল। জুন মাসে প্রতি ষোল জনের ছয়জন মারা গিয়েছিল। শেষাবধি জমিতে আবাদ করার মতো পর্যাপ্ত লোকও আর অবশিষ্ট ছিল না"।

কিন্তু তার পরও ক্ষুধা মেটেনি ইংরেজ কোম্পানীর। তখনও চলছিল তাদের

শোষণ-পীড়ন। শকুনের মতো লাশের ওপর বসেও কোম্পানীর কর্মচারীরা নিজেদের হীনস্বার্থ সিদ্ধির জন্যে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালিয়েছিল। অত্যাচার চালিয়েছিল তারা বাংলার নিরীহ মানুষ—মূলত গরীব, কৃষক শ্রেণীর মুসলমানের ওপর।

মুসলমানের এই করুণ অবস্থা দেখে মিঃ হান্টার আফসোস করে বলেছিলেন ঃ

"একশো সত্তর বছর আগে বাংলার কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের দরিদ্র হওয়া ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার, আর বর্তমানে তাদের পক্ষে ধনী হওয়াই অসম্ভব ব্যাপার।"

বাংলার বুকে ইংরেজরা এই মহা দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করেছিল বাংলা এগারো শো ছিয়াত্তর সালে।

নিসার আলীর জন্মের কিছুটা আগে হলেও, তিনি যখন ভূমিষ্ঠ হলেন তখনো সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ছাপ অবশিষ্ট ছিল বাংলার বুকে।

তখনো মুছে যায়নি সেদিনের সেই ক্ষত চিহ্ন।

তখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি বাংলার মুসলমান।

তখনো এতোটুকু সোজা হয়নি তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। ফিরে আসেনি ভাগ্যের সেই সোনালী দিন।

শুধু ইংরেজদের চাপিয়ে দেয়া দুর্ভিক্ষেই নয়। ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক দিক দিয়েও মুসলমানরা ছিল চরম নির্যাতনের শিকার। ইংরেজদের হিংস্র থাবায় রক্তাক্ত হয়েছিল মুসলমানের বুক।

নিসার আলীর জন্মের সময়ে কেমন ছিল বাংলার ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশ?

ইংরেজদের ষড়যন্ত্র কতোদূর পৌঁছেছিল সেদিন ?

নিসার আলী কেন বাধ্য হয়েছিলেন সংগ্রামের দাউ দাউ আগুন জ্বালিয়ে দিতে বাংলা ঘরে ঘরে?

তাঁর পরবর্তী সংগ্রামের ইতিহাস জানার আগে এসব বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

ধর্মীয় অবস্থা

সময়টা ছিল খুবই খারাপ। মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থা ছিল তার চেয়েও নাজুক।

সে ছিল এক ঘোরতর অন্ধকারের দিন।

হিন্দুরা ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে মুসলমানদের কেবল রাজ্যহারা, ক্ষমতাহারাই করেনি— তারা তাদের জীবিকা অর্জনের সকল পন্থা বন্ধ করে দিয়েছিল। তাতেও খুশি হয়নি ইংরেজ এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুরা।

শেষ পর্যন্ত তারা মুসলমানের একমাত্র সম্বল ঈমানটুকুও কেড়ে নিতে চেয়েছিল নানা কৌশল এবং প্রলোভনের মাধ্যমে।

তারা মুসলমানদেরকে প্রথমত নামে মুসলমান রেখে ইসলাম, ও ঈমান-আকীদা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে বাধ্য করতো। তাদেরকে দূরে রাখতো ইসলামী জীবন পদ্ধতি ও সংস্কৃতি থেকে। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর চেয়েও তখনকার মুসলমানের জীবন ছিল নিকৃষ্ট। তারা তাদের দাসানুদাস বানিয়ে রাখতে চাইতো।

হিন্দু জমিদাররা ছিল ইংরেজদের একান্ত প্রিয়পাত্র। ইংরেজদের তুষ্ট করার জন্যে তারা সব সময় ব্যস্ত থাকতো। তারা জানতো— মুসলমানকে দাবিয়ে রাখতে পারলেই কেবল সর্বগ্রাসী শাসন প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

এই জমিদার শ্রেণীর হিন্দুরাই সেদিন ইংরেজদের প্রত্যক্ষ মদদে মুসলমানকে ইসলামের আলো থেকে অনেক-অনেক দূরে সরিয়ে রাখার নানান কূটকৌশল করেছিল। উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা গরীব মুসলমানকে বুঝিয়ে বলতো ঃ

"তোরা গরীব। কৃষি কাজ ও দিন মজুরী না করলে তোদের সংসার চলে না। এমন অবস্থায় তোদের প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক ও বার্ষিক নামায বা রোযা, হজ্জ,

যাকাত, জানাজা, প্রার্থনা, মৃতদেহ স্নান করানো প্রভৃতি ধর্ম কর্ম করবার সময় কোথায় ? আর ঐসব ধর্ম কর্ম করে তোরা অর্থোপার্জন করবার সময় পাবি কখন এবং সংসার যাত্রাই বা করবি কিভাবে? সুতরাং তোরাও হিন্দু ব্রাহ্মণদের মত একদল লোক ঠিক কর। তারা তোদের হয়ে ঐসব ধর্মীয় কাজগুলো করে দেবে। তোদেরও আর সময় নষ্ট হবে না।"

উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মুসলমানদের দুরাবস্থার সুযোগ নিয়ে আরও বুঝাতো ঃ

"তোমরা বাপু মুসলমান হলেও বাংলাদেশের মুসলমান। আরবদেশের মুসলমানের জন্যে যেমন আরবী নামের প্রয়োজন, বাংলাদেশের মুসলমানের জন্যেও তেমনি বাংলা নামের প্রয়োজন। আবদুর রহমান, আবুল কাশেম, রহীমা খাতুন, আয়েশা, ফাতেমা নামের পরিবর্তে বাংলা ভাষার নামের প্রয়োজন।"

ঠাকুরদের চাপের মুখে অসহায় মুসলমানরা সেদিন তাদের সন্তানদের মুসলমানী নাম বাদ দিয়ে গোপাল, নেপাল, নবাই, গোবর্ধন, কুশাই, বাদল, পটল প্রভৃতি নাম রাখতে বাধ্য হতো। এছাড়াও তারা কৌশলে মুসলমানকে লুঙ্গি ছেড়ে ধূতি পরতে বাধ্য করতো। বাধ্য করতো দাড়ি ছেটে গোঁফ রাখতে। তারপর তাদের দিয়ে পূজা পার্বনে খাটাতো বিনা পারিশ্রমিকে। তাদের পূজার জন্যে ছাগল, মুরগী, নগদ অর্থসহ বিভিন্ন জিনিস জোর করে আদায় করতো।

মোট কথা, কোনো ভাবেই তারা মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোকে সহ্যই করতে পারতো না।

শিক্ষা ব্যবস্থা

সেই সময়ে সর্বক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের ছিল প্রবল দাপট। শকুনের মতো ডানা বিস্তার করেছিল প্রতিটি ক্ষেত্রে।

ইংরেজদের প্রত্যক্ষ মদদে তখন হিন্দু জমিদারদের অবস্থা অত্যন্ত ভাল।ফুলে ফেঁপে তারা কলাগাছ হয়ে গেল রাতারাতি।

তাদের ষড়যন্ত্রে মুসলমানদের জাতীয় ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে গেল। গ্রামে গ্রামে হিন্দু পণ্ডিতদের গ্রাম্য পাঠশালা স্থাপিত হলো। নামী-দামী পাঠশালায় মুসলমানের সন্তানদের লেখাপড়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেল।

গ্রামের পাঠশালার অবস্থাও ছিল অত্যন্ত নাজুক।

এসব পাঠশালায় নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-কুমার, কামার, নাপিত, ধোপাদের সন্তানরা আসা-যাওয়া করতো। মুসলমানের সন্তানদেরকেও তাদের সাথে একত্রে লেখাপড়া করতে হতো। ফলে শৈশবকালে, সেই কচি হৃদয়ে মুসলিম পরিবারের সন্তানদের মধ্যে হিন্দুয়ানী শিক্ষা ও সংস্কৃতি কৌশলে হিন্দু পণ্ডিতরা ঢুকিয়ে দিতো।

মুসলমান ছাত্রদেরকেও হিন্দু দেবদেবীর স্তবস্তূতি মুখস্থ করতে হতো। বিশেষ করে সরস্বতীর বন্দনা মুখস্থ করা তাদের জন্যে ছিল বাধ্যতামূলক।

তখনকার পাঠ্যবইয়ে হিন্দু ধর্মের মহিমা কীর্তন, দেবদেবীর বন্দনা ও স্তবস্তূতিতে ছিল পরিপূর্ণ।

ছুটি হবার পর পাঠশালা ত্যাগ করার সময় তখন একটি ছড়া আবৃত্তি করে গুরু মহাশয়কে নমস্কার করে বাড়ি ফিরতে হতো।

সেই ছড়াটি হলো ঃ

সরস্বতী ভগবতী, মোরে দাও বর,
চল ভাই পড়ে সব, মোরা যাই ঘর।
ঝিক্নিমিকি ঝিকিরে সুবর্ণের চক,
পাত-দোঁত নিয়ে চল, জয় গুরুদেব।

নিসার আলীর সময়টা ছিল এমনি। এমনি ছিল তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থা।
অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর হিন্দুদের আধিপত্যের কারণে মুসলমানদের ঘরে ঘরে বিরাজ করতো অন্ধকার। ঘোরতর অন্ধকার।
সেই অন্ধকারের মধ্যেই ধীরে ধীরে জ্বলে উঠলো একটি আলোর মশাল।
নাম তাঁর— নিসার আলী তিতুমীর।

স্বদেশে ফেরার পর

মক্কা থেকে হজ্জ ও সফর শেষ করে দেশে ফিরলেন নিসার আলী।

দেশে ফিরে তিনি দেখলেন তাঁর স্বজাতির করুণ অবস্থা।

দেখলেন ইংরেজ দস্যু এবং জমিদারদের অত্যাচারের নির্মম চিত্র। দেখলেন মুসলিম সমাজ ভেসে যাচ্ছে এক অমানিশার মহা সমুদ্রে।

এসব দেখে আঁতকে উঠলেন নিসার আলী।

কেঁদে উঠলো তাঁর কোমল হৃদয়।

তিনি ভাবলেন, আর বসে থাকার সময় নেই।

এখনিই কূলে ভেড়াতে হবে মুসলমানের ভাসমান তরী। তা না হলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ইসলামের আলো। শেষ হয়ে যাবে আমাদের সমাজ। আমাদের স্বজাতি।

মুসলমানের মুক্তির জন্যে নিসার আলীর বুকে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল।

তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তাদেরকে মুক্ত করতে হবে ইংরেজ গোলামী থেকে। হিন্দুদের খপ্পর থেকে। মুক্ত করতে হবে ইসলামকে। মুক্ত করতে হবে বাংলার কৃষককে তথা সকল মানুষকে।

এই চেতনা থেকেই নিসার আলী কাল বিলম্ব না করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার নিয়ে।

দৃপ্ত শপথ নিয়ে তিনি তাঁর যাত্রা শুরু করলেন।

সেই যাত্রার নাম— উত্তাল সংগ্রাম।

সময়টা ছিল আঠার শো সাতাশ সাল।

যাত্রা হলো শুরু

স্বদেশে ফিরে কয়েকদিন একটু বিশ্রাম নিলেন নিসার আলী।

দীর্ঘ ভ্রমণে তিনি ক্লান্ত বোধ করছিলেন। কিন্তু বেশি দিন আর বিশ্রাম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। কর্তব্য তাঁকে ডাকছে হাতছানি দিয়ে।

কর্তব্যের টানে নিসার আলী নির্দিষ্ট সময়ে সাড়া দিলেন সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর আহ্বানে।

মক্কা থেকে বিদায় নেবার সময় তিনি তাঁর সাথীদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, একটি নির্দিষ্ট দিনে সবাই একত্রিত হবেন।

কথাটা ভোলেননি নিসার আলী।

তিনি রওয়ানা দিলেন।

একে একে সবাই এলেন। সাইয়েদ আহমদও উপস্থিত হয়েছেন। জায়গাটি ছিল— কলকাতার শামসুননিসা খানমের বাগান বাড়ি।

শামসুননিসা খানমের বাগান বাড়িতে বসে তাঁদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা হলো।

আলোচনা হলো ইংরেজ শাসন, হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার এবং মুসলমাননের দুরাবস্থা নিয়ে।

আলোচনা চললো বহুক্ষণ ধরে।

আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, মুসলমানদের মুক্তির জন্যে একটি মুজাহিদ বাহিনী গঠন করা হবে।

সেই মুজাহিদদের কেন্দ্রীয় রাজধানী হবে পাটনা। প্রত্যেক প্রদেশে হবে প্রাদেশিক রাজধানী। প্রাদেশিক রাজধানী থেকে কেন্দ্রে জিহাদ পরিচালনার জন্যে অর্থ প্রেরণ করা হবে।

এসব সিদ্ধান্তের পর নিসার আলী উপস্থিতিদেরকে লক্ষ্য করে একটি ভাষণ

দেন। সেই ভাষণে তিনি বলেন ঃ

"বাংলাদেশের মুসলমানদের ঈমান খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাদেরকে খাঁটি মুসলমান না করা পর্যন্ত জিহাদে পাঠানো বিপজ্জনক হবে। আমি তাদের মধ্যে ইসলামী দাওয়াত পৌঁছুবার দায়িত্ব নিচ্ছি। শুধু তাই নয়, আমি মনে করি, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও আমাদের সংগ্রামে যোগদান করতে পারে। কারণ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ জাতির ওপর নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা সন্তুষ্ট নয়। আমরা যদি মুসলমানদেরকে পাক্কা মুসলমান বানিয়ে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানকে একত্রিত করতে পারি তাহলে.... কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে কেন্দ্রকে সাহায্য করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হবেনা।"....

অবাক মিছিল

সাইয়েদ আহমদের সাথে বৈঠক শেষ করে কলকাতা থেকে ফিরে এলেন নিসার আলী আপন গ্রামে।

গ্রামে ফিরে এসে তিনি শুরু করলেন তাঁর দাওয়াতী অভিযান।

তিনি সরল সহজ ভাষায় বুঝান সাধারণ মুসলমানকে। বুঝান তাদেরকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য।

বুঝান আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের পথ।

তিনি ভাগ্যহত মুসলমানদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতেন। তাদের কাছে পৌঁছে দিতেন সত্যের আহ্বান।

নিসার আলীর এই দাওয়াতের মূল কথা ছিল— ইসলামে পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন এবং প্রত্যেকটি কাজকর্মে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সা) অনুসরণ।

মুসলমানদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেবার জন্যে নিসার আলী ত্যাগ করলেন নিজের ব্যক্তিগত আরাম আয়েশ। ত্যাগ করলেন সুখ-সম্ভোগ। ত্যাগ করলেন অর্থ-বিত্ত আর প্রতিপত্তির লালসা। নিজেকে তিনি কুরবানী করে দিলেন আল্লাহর রাস্তায়।

তখনো দীন প্রচারের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত নিসার আলী।

চারপাশের অবহেলিত লাঞ্ছিত মুসলমান একে একে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে।

তারা শামিল হচ্ছে আলোর মিছিলে।

দীনি দাওয়াতের পাশাপাশি নিসার আলী লক্ষ্য করলেন তাঁর চারপাশকে। দেখলেন ইংরেজদের শোষণ আর উৎপীড়ন। দেখলেন হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার। বুঝলেন,মুসলমানকে তারা মানুষের মধ্যেই গণ্য করেনা।

বাংলার মুসলমানদের এই করুণ অবস্থায় কেঁদে উঠলো নিসার আলীর হৃদয়।

তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না তাদের আর্তনাদ, তাদের আকাশ বিদারী আহাজারী।

মুহূর্তেই তিনি ফিরে দাঁড়ালেন।

ফিরে দাঁড়ালেন সাহসের পর্বতকে বুকে ধারণ করে। ভাবলেন— শুধু ইসলামের দাওয়াত দিলেই মুসলমানের ভাগ্যের চাকা ঘুরানো যাবেনা। এরজন্যে প্রয়োজন— সম্মুখ সংগ্রামের।

গর্জে উঠলেন দুঃসাহসী নিসার আলী। তিনি বললেন ঃ

"কৃষক সম্প্রদায়ের হিন্দুদের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।"

এবং তারপর।—

তারপরই নিসার আলী জাগিয়ে তুললেন এক অসামান্য আলোর মিছিল। তাঁর সাথে যুক্ত হলো ধীরে ধীরে হাজার হাজার মুক্তিপাগল মানুষ।

যুক্ত হলো তারা নিসার আলীর জীবন জাগানো অবাক মিছিলে।

প্রতিবাদের ফুলকি

দীনি দাওয়াতের কাজ করার জন্যে নিসার আলীর নামটি তখন ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

একদিনের ঘটনা।

সরফরাজপুর নামক গ্রামবাসীরা ছুটে এলো তাঁর কাছে।

তারা জানালো তাদের বুকে জমে থাকা হাজারো দুঃখ-ব্যথার কথা।

সরল সহজ নিপীড়িত মানুষ তারা। তারা মুসলমান। অথচ নামায আদায় করতে পারেনা। মসজিদে গিয়ে আদায় করতে পারেনা জুমআর নামায। কী ভীষণ বেদনার ব্যাপার!

ধীরস্থির ভাবে মন দিয়ে নিসার আলী শুনলেন তাদের কথা। তারপর তাদের অনুরোধে তিনি সেখানকার ধ্বংসপ্রাপ্ত শাহী মসজিদটি পুনঃনির্মাণের ব্যবস্থা করে দিলেন।

এই শাহী মসজিদ পুনঃনির্মাণের পর সেখান থেকে প্রচারের জন্যে তিনি একটি খানকাও স্থাপন করেন।

হিন্দু জমিদারদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে নিসার আলী পুনঃনির্মাণ করলেন সরফরাজপুর শাহী মসজিদ। তাঁর এই উদ্যোগটি ছিল ইংরেজ ও হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রথম ফুলকি।

মসজিদটি নির্মাণের পর সেই এলাকার মুসলমানের মনে আবার স্বস্তি ফিরে এলো। তারা পুনরায় প্রশান্ত হৃদয়ে পাঞ্জেগানা ও জুমআর নামায আদায় করতে থাকলো।

এই মসজিদে জুমআর নামাযের পর নিসার আলী নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানকে আহ্বান করে একটি ভাষণ দেন।

ইতিহাসখ্যাত এই ভাষণটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এখন নিসার আলীর সেই ভাষণটির সাথে পরিচিত হবো।

একটি ঐতিহাসিক ভাষণ

সরফরাজপুর শাহী মসজিদে জুমআর নামায শেষে হিন্দু-মুসলমানকে আহ্বান করে নিসার আলী বলেন ঃ

"ইসলাম শান্তির ধর্ম। যারা মুসলমান নয় তাদের সাথে শুধু ধর্মের দিক দিয়ে পৃথক বলে, বিবাদ বিসম্বাদ করা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কিছুতেই পছন্দ করেন না।

তবে ইসলাম একথা বলে, যদি কোনো প্রবল শক্তিশালী অমুসলমান কোনো দুর্বল মুসলমানের ওপর অন্যায় উৎপীড়ন করে, তাহলে মুসলমানরা সেই দুর্বলকে সাহায্য করতে বাধ্য।...

মুসলমানকে কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে, চাল-চলনে প্রকৃত মুসলমান হতে হবে।

তারা যদি অমুসলমানের আচার-আচরণ, চাল-চলন ও কাজকর্ম পছন্দ করে, তাহলে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্ তাদেরকে অমুসলিমদের সাথে স্থান দেবেন।

.... ইসলামী শরীয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফত— এই চার মিলিয়ে মুসলমানদের পূর্ণাঙ্গ জীবন এবং এর মধ্যেই রয়েছে তাদের ইহকাল-পরকালের মুক্তি।

এর প্রতি কেউ উপেক্ষা প্রদর্শন করলে আল্লাহ্ তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন।

নামায পড়া, রোযা রাখা, দাড়ি রাখা, গোঁফ ছাঁটা মুসলমানদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। যারা অমুসলমানদের আদর্শে এসব পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেবেন।"

নিসার আলীর ডাক

ওয়াজ-নসিহত, বক্তৃতা এবং সদুপদেশের মাধ্যমে নিসার আলী ডাকতে থাকেন লাঞ্ছিত মানুষকে।

তিনি ডাকেন আল্লাহর পথে।

রাসূলের (সা) পথে।

তিনি তাদেরকে বুঝান—ইসলামের পথই সত্য-সঠিক পথ।

নিসার আলীর বুকে ছিল সাহসের সমুদ্র। ছিল পর্বত সমান বিশ্বাস। বিশ্বাস এবং আস্থা ছিল আল্লাহর ওপর। যিনি সকল সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা।

দেশকে ইংরেজ শাসন মুক্ত করা ছিল নিসার আলীর স্বপ্ন। তাঁর সাধ ছিল দেশ এবং মানুষকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করা।

ইচ্ছা ছিল— জীবন বিধান ইসলামকে যাবতীয় অন্যায় অবিচার আর নানাবিধ জঞ্জাল থেকে কলুষমুক্ত করা। ইসলামের পূর্ণ বিকাশ দেখতে চেয়েছিলেন নিসার আলী তাঁর দেশের মাটিতে। মানুষের মাঝে।

এজন্যে তিনি মনে করলেন, প্রথমে প্রয়োজন— সাধারণ মানুষের মাঝে দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর।

ঘুম ভাঙ্গানোর প্রয়োজন এই জাতিকে।

তিনি জানতেন, যদি একবার এই জাতি মাথা উঁচু করে, গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় সাহসের সাথে, তাহলে হিন্দু জমিদার কেন, ইংরেজ দস্যু কেন— পৃথিবীর কোনো শক্তিই আমাদের সামনে টিকতে পারবে না।

ঈমানের শক্তি— ভীষণ এক শক্তি।

সাহসের শক্তি— দুর্বার এক শক্তি।

সেই শক্তিকে রুখতে পারেনা কেউ।

অসীম আত্মবিশ্বাসে মানুষকে সত্যের পথে ডাকতে থাকেন নিসার আলী। ডাকতে থাকেন ধৈর্যের সাথে।

একদিকে অভাব-দারিদ্র্যের কষ্ট। অপর দিকে হিন্দু জমিদার এবং ইংরেজদের শোষণ অত্যাচার আর নির্যাতনের নিত্য নতুন অপছোবল। এতো লাঞ্ছনার মুখে আর টিকতে পারছিল না তখনকার মানুষ।

তারাও মুক্তি চাচ্ছিল।

মুক্তি চাচ্ছিল এইসব অত্যাচারীদের নির্মম নিষ্ঠুর পদাঘাত থেকে।

তাই নিসার আলীর ডাক যখন তাদের কাছে পৌঁছুলো তখন তারা আবার কিছুটা স্বস্তি ফিরে পেল। তারা আবার যেন ফিরে পেল প্রাণ।

মুহূর্তে জেগে উঠলো তারা।

প্রতিবাদী ভঙ্গিতে তারা ফিরে দাঁড়ালো। তাদের সামনে আছেন সাহসী এক সেনাপতি— সাইয়েদ নিসার আলী।

কয়েক মাসের মধ্যেই তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়ে গেল চার/পাঁচ শো। বিরাট ব্যাপার বটে!

এদের মধ্যে ছিল নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মুসলমান— ছিল চাষী, মজুর, তাঁতী ও সমাজের অন্যান্য পেশার মেহনতী মানুষ। এদের মধ্যে অনেক উচ্চবর্ণের হিন্দু ও হিন্দু জমিদার কর্তৃক নিপীড়িত নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও ছিল।

এরা সবাই সেদিন নিসার আলীর ডাকে সাড়া দিয়েছিল। নতুন করে বাঁচার জন্যে তাদের মুখেও সেদিন জ্বলে উঠেছিল দাউ দাউ প্রতিবাদের ভয়ালো আগুন।

অশুভ কম্পন

নিসার আলীর জ্বালাময়ী ভাষণে আগুন ধরে গেল ইংরেজ এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বুকে। আগুন ধরে গেল জমিদারদের হৃদয়ে। নিসার আলীর দাওয়াত এবং তাঁর হুংকারে কেঁপে উঠলো তারা। কম্পন তুললো তাদের দুরু দুরু বুকে।—

এই বুঝি নস্যাৎ হয়ে গেল তাদের সকল ষড়যন্ত্র।

এই বুঝি ভেঙ্গে পড়লো তাদের মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের নির্মূল করার পরিকল্পনা।

ভীষণভাবে ক্ষেপে গেল উচ্চবর্ণের হিন্দুরা।

ক্ষেপে গেল ইংরেজরা।

হিংস্র পশুর মতো তারা ক্ষেপে উঠলো নিসার আলীর ওপর।

আসলে এমনটিই হয়।

সত্যের পথে লড়তে গেলে বিরুদ্ধ পক্ষরা ক্ষেপে তো যাবেই। কেননা তাদের স্বার্থ এবং ক্ষমতার দর্প তখন তো আর অবশিষ্ট থাকবে না!

তখন ভেঙে পড়বে তাদের মিথ্যার মসনদ।

ভেঙে পড়বে বিলাসী বালাখানা।

আর ফুরফুর করে উড়ে যাবে সকল অবাঞ্ছিত স্বপ্ন।

অপূর্ণ রয়ে যাবে তাবৎ আকাঙ্ক্ষা।

ভয়গুলো প্রবেশ করলো তাদের শরীরে বিষাক্ত সাপের ছোবলের মতো। তারা আর স্থির থাকতে পারলো না। তাদের এতো দিনের ভোগ-বিলাস আর আরামের ঘরে অকস্মাৎ প্রবেশ করলো আতংক। প্রকম্পিত হয়ে উঠলো তারা।

ভেবে চিন্তে তারা বার করলো নিসার আলীর বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রের ধারালো অস্ত্র। এবং তা প্রয়োগ করতে লাগলো একের পর এক।

বাধার পর্বত

নিসার আলীর তৎপরতায় হিংসায় মরিয়া হয়ে উঠলো যারা— তাদের মধ্যে প্রথম হলো পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়।

কৃষ্ণদেব কেবল অত্যাচারী জমিদারই ছিলনা। সে ছিল অন্যান্য অত্যাচারী জমিদারদের এক জঘন্য নেতাও। বিরাট তার দাপট। বিশাল তার প্রতিপত্তি। এতোদিন যাবৎ সে অবাধে নির্যাতন চালিয়ে আসছিল তার প্রজা—মুসলমান এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ওপর।

অত্যাচার আর শোষণ করে যাচ্ছিল তাদেরকে।

কিন্তু বাধ সাধলো নিসার আলীর দাওয়াত। বাধ সাধলো তার কর্মতৎপরতা।

এসব দেখে জমিদার কৃষ্ণদেব ক্ষেপে গেল চরমভাবে। সে মেতে উঠলো নতুন ষড়যন্ত্রে।

নিসার আলীর গতিবিধি, কার্যক্রম এবং প্রচার ও প্রচারণার খবরাখবর সংগ্রহের জন্যে কৃষ্ণদেব উতলা হয়ে উঠলো।

জমিদার বলে কথা!

তার ছিল অনেক পাইক-পেয়াদা, গোমস্তা এবং বরকন্দাজ।

এদের মধ্যে অনেক অসহায় মুসলমানও ছিল। যারা নিতান্ত পেটের দায়ে কৃষ্ণদেবের তাবেদারী করতো।

কৃষ্ণদেব ছিল খুবই ধূর্ত।

সে ভাবলো, কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে।

তার অধীনে ছিল একজন মুসলমান পাইক। নাম— মতিউল্লাহ। জমিদার কৃষ্ণদেব তাকে 'মতিলাল' বলে ডাকতো। একদিন মতিকে ডেকে কৃষ্ণদেব বললো ঃ

"তিতু ওহাবী ধর্মাবলম্বী। ওহাবীরা তোমাদের হযরত মুহাম্মদের ধর্মমতের পরম শত্রু। কিন্তু তারা এমন চালাক যে, কথার মধ্যে তাদেরকে ওহাবী বলে ধরা যাবে না। সুতরাং আমার মুসলমান প্রজাদেরকে বিপথগামী হতে দিতে পারিনা। আজ থেকে তিতুর গতিবিধির দিকে নজর রাখবে এবং সব কথা আমাকে জানাবে।"

ষড়যন্ত্রের প্রথম ছোবল

নিসার আলীর কার্যক্রমের ওপর নজর রাখার দায়িত্ব মতিউল্লাহ্‌র ওপর ছেড়ে দিয়েও নিশ্চিন্তে বসে থাকলো না কৃষ্ণদেব রায়।

সে ছুটে গেল গোবরা গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায়ের কাছে। ছুটে গেল গোবর ডাঙার জমিদার কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের কাছেও।

তাদের সাথে ষড়যন্ত্রের নানা অলিপথ গলিপথ নিয়ে আলোচনা করলো ধূর্ত কৃষ্ণদেব।

পরামর্শ আর আলাপ-আলোচনা চললো দীর্ঘক্ষণ। তাদের পিছনে ছিল ইংরেজদের প্রত্যক্ষ মদদ। ছিল তাদের ইন্ধন।

এক সময় পরামর্শ সভা শেষ হলো।

সিদ্ধান্ত নিল তারা — শান্তিভংগের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হবে নিসার আলীকে। এই অভিযোগটি উত্থাপনের ভার দেয়া হবে প্রজাদের ভেতর কোনো মুসলমানকে। তারপর তাদের কাছে অভিযোগ নিয়ে গেলে তারা নিসার আলীর বিচার করবে।

সিদ্ধান্তের পালা শেষ।

এবার মুসলমান প্রজা খোঁজার পালা।

কৃষ্ণদেব আবার ডাকলো মতিউল্লাহকে।

মতিউল্লাহ্ কৃষ্ণদেবের একজন বিশ্বস্ত অনুচর।

পয়সা আর সুযোগ সুবিধার আশ্বাস দিয়ে জমিদার কৃষ্ণদেব তাকে বললো, তোকে একটা কাজ করতে হবে।

মতিউল্লাহ্ জিজ্ঞেস করলো, কি কাজ ?

কৃষ্ণদেব আস্তে করে বললো— "তুই তোর পরিবার থেকে কয়েকজনকে নিয়ে নিসার আলীর বিরুদ্ধে একটি নালিশ পেশ করবি আমার কাছে। শান্তি

ভংগের নালিশ। আমি বলে দেব তাতে কি কি জানাবি। তারপর আমি তোদের হিতের জন্যে নিসার আলীর বিচার করবো।"

মূর্খ মানুষ মতিউল্লাহ।

সে সাত-পাঁচ কিছু না বুঝে বললো, "ঠিক আছে। আপনি যা ভালো বোঝেন।"

এরপর কৃষ্ণদেবের সাজিয়ে দেয়া অভিযোগসহ তারই কাছে নালিশ জানালো মতিউল্লাহ। সাথে ছিল তার চাচা গোপাল, জ্ঞাতি ভাই নেপাল ও গোবর্ধন। তারা কৃষ্ণদেবের ষড়যন্ত্রে পা দিয়ে তারই সাজিয়ে দেয়া নালিশে মিথ্যা এবং বানোয়াট অভিযোগ করলো যে ঃ

"চাঁদপুর নিবাসী তিতুমীর তার ওহাবী ধর্ম প্রচারের জন্যে আমাদের সর্পরাজপুর (মুসলমানী নাম সরফরাজপুর) গ্রামে এসে আখড়া গেড়েছে এবং আমাদেরকে ওহাবী ধর্মমতে দীক্ষিত করার জন্যে নানা রকম জুলুম জবরদস্তি করছে। আমরা বংশানুক্রমে যেভাবে বাপ-দাদার ধর্ম পালন করে আসছি, তিতুমীর তাতে বাধা দান করছে। তিতুমীর ও তার দলের লোকেরা যাতে সর্পরাজপুরের জনগণের ওপর কোনো প্রকার অত্যাচার করে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করতে না পারে, জোর করে আমাদের দাড়ি রাখতে, গোঁফ ছাটতে, গোহত্যা করতে, আরব দেশের নাম রাখতে বাধ্য করতে না পারে, হিন্দু-মুসলমানে দাংগা বাধাতে না পারে, হুজুরের দরবারে তার বিহিত ব্যবস্থার জন্যে আমাদের নালিশ। হুজুর আমাদের মনিব। হুজুর আমাদের বাপ মা।"

কৃষ্ণদেবের হুকুম জারী

মতি, গোপাল, নেপাল, গোবর্ধনের টিপসই যুক্ত নালিশের পত্রটি পাওয়ার পর মুখ টিপে হাসলো অত্যাচারী চতুর জমিদার—কৃষ্ণদেব রায়। হাজার হোক নিজেরই ষড়যন্ত্রের ফসল। নিজেরই তৈরি করে দেয়া নালিশনামা।

অভিযোগপত্র কয়েকবার উল্টেপাল্টে পড়লো কৃষ্ণদেব। না, যা যা বলেছিলাম— সবই ঠিকঠাক আছে। কোনো কিছুই বাদ যায়নি।

সে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল। ঠিক করে রেখেছিল কৃষ্ণদেব, নালিশের প্রেক্ষিতে কি ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে।

ব্যাস। মতির নালিশটি পাবার পরপরই কৃষ্ণদেব বিচারের প্রহসন করলো। তারপর হুকুম জারী করলো ঃ

১. যারা তিতুমীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ওহাবী হবে, দাড়ি রাখবে, গোঁফ ছাটবে তাদেরকে ফি দাড়ির জন্যে আড়াই টাকা ও ফি গোঁফের জন্যে পাঁচ সিকা করে খাজনা দিতে হবে।

২. মসজিদ তৈরি করলে প্রত্যেক কাঁচা মসজিদের জন্যে পাঁচশো টাকা এবং প্রতিটি পাকা মসজিদের জন্যে একহাজার টাকা করে জমিদার সরকারে নজরানা দিতে হবে।

৩. বাপ দাদা সন্তানদের যে নাম রাখবে তা পরিবর্তন করে ওহাবী মতে আরবী নাম রাখলে প্রত্যেক নামের জন্যে খারিজানা ফিস পঞ্চাশ টাকা জমিদার সরকারে জমা দিতে হবে।

৪. গোহত্যা করলে তার ডান হাত কেটে দেয়া হবে— যাতে আর কোনোদিন সে গোহত্যা করতে না পারে।

৫. যে ওহাবী তিতুমীরকে বাড়িতে স্থান দেবে তাকে ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করা হবে।

এই হুকুম জারীর পর তা পালন করার জন্যে অত্যাচারী কৃষ্ণদেব তার মুসলমান প্রজাদের ওপর নতুন মাত্রায় অত্যাচার আর নির্যাতন শুরু করে দিল।

শুধু কৃষ্ণদেব নয়। তার দেখাদেখি এবং তারই অনুরোধে এধরনের হুকুম জারী করলো আরও বেশ কয়েকজন জমিদার। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য — তারাগুনিয়ার জমিদার রাম নারায়ণ, গোবরা গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায়, গোবর ডাঙ্গার জমিদার কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, কুরগাছির জমিদারের নায়েব নাগরপুর নিবাসী গৌড় প্রসাদ চৌধুরী প্রমুখ জুলুমবাজ।
বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে জমিদার রাম নারায়ণের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। যাতে জনৈক মুসলমান অভিযোগ করেছিল, "উক্ত জমিদার দাড়ি রাখার জন্যে তাকে পঁচিশ টাকা জরিমানা করে এবং দাড়ি উপড়ে ফেলার আদেশ দেয়।"
কিন্তু এই মামলার কোনো বিচারই হয়নি।
এ কেবল একটি মামলার কথা।
এ কেবল একজন মুসলমানের আরজির কথা।
এরকম হাজার হাজার মুসলমানের আরজি, তাদের হৃদয়ের হাহাকার, তাদের ফরিয়াদ কেবল শূন্যে ভেসে গিয়েছিল।
জমিদারদের অত্যাচারের ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস পেত না। আর যারা সাহস করে মুখ খুলতো, তাদের ভাগ্যে জুটতো কেবল শাস্তি আর শাস্তি।

তবু জমিদারদের এসব রক্তচক্ষু আর জুলুম অত্যাচারের প্রাচীর টপকে সেদিন গর্জে উঠেছিলেন বাংলার দুঃসাহসিক অগ্রসেনানী— সাইয়েদ নিসার আলী। আর তাঁর সাথে ছিল সেদিন নির্ভীক সৈনিকদের একটি সুশৃংখল বাহিনী। যাদের সম্বল ছিল একমাত্র —ঈমান।

সেই বলিষ্ঠ ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে সেদিন কৃষ্ণদেবের অন্যায় এবং অত্যাচারমূলক এই হুকুম জারীর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর। পাশে ছিল তাঁর একদল দুঃসাহসী সাথী — আলোর পাখিরা।

নিসার আলীর পত্র

জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের হুকুম জারীর পর এতটুকু দমে গেলেন না সাইয়েদ নিসার আলী।

তিনি ভাবলেন, এমনটি হওয়াই তো স্বাভাবিক। সুতরাং একটা কিছু তো করা উচিত। করতেই হয়।

কাল বিলম্ব না করে নিসার আলী কৃষ্ণদেবকে একটি পত্র লিখলেন। পত্রে তাকে জানালেন, তিনি কোনো অন্যায় কাজ করেননি।

তিনি কেবল মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ করছেন। এ কাজে হস্তক্ষেপ করা কোনোক্রমেই ন্যায়সঙ্গত নয়। নামায পড়া, রোযা রাখা, দাড়ি রাখা, গোঁফ ছাটা প্রভৃতি মুসলমানের জন্যে ধর্মীয় নির্দেশ। এ কাজে বাধা দেয়া— অপর ধর্মের ওপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপেরই শামিল। এটা সমর্থনযোগ্য নয়।

যথাসময়ে পত্রটি তিনি পাঠিয়ে দিলেন অত্যাচারী জমিদার কৃষ্ণদেবের কাছে।

আন্দোলনের প্রথম শহীদ

নিসার আলীর পত্রখানা কৃষ্ণদেবকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিল তাঁর একজন সাথী। নাম— আমিন উল্লাহ।

যথা সময়ে কৃষ্ণদেবের কাছে পৌঁছে গেল সে। তারপর চিঠিখানা তাকে দিল।

চিঠি পড়েই রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়লো জমিদার কৃষ্ণদেব।

খিস্তি খেউড় করতে করতে বললো, "সেই তিতু আমাকে চিঠি দিয়েছে? আর তুই ব্যাটা কে?"

কৃষ্ণদেবের ধারে কাছেই উপস্থিত ছিল মুচিরাম ভাণ্ডারী। সাথে সাথে মুচিরাম বললো, "ওর নাম আমন মণ্ডল। বাপের নাম কামন মণ্ডল। ও হুজুরের প্রজা। আগে দাড়ি কামাতো। আর এখন দাড়ি রেখেছে বলে হুজুর চিনতে পারছেন না।" হিঃ হিঃ করে হেসে উঠলো মুচিরাম।

পত্র বাহকের নাম বিকৃত করে বলায় তার আত্মসম্মানে বাধলো। সাথে সাথে প্রতিবাদ করে বললো, "না হুজুর,আমার নাম— আমিন উল্লাহ। বাপের নাম— কামালউদ্দীন। লোকে আমাদেরকে আমন-কামন বলে ডাকে। আর দাড়ি? দাড়ি রাখা আমাদের ধর্মের আদেশ। সেই আদেশই আমি পালন করেছি।"

আমিন উল্লাহর জবাব শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো জমিদার কৃষ্ণদেব রায়। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললো, "ব্যাটা! দাড়ি রেখেছিস, দাড়ির খাজনা দিয়েছিস? নাম বদলের খাজনা দিয়েছিস? ব্যাটা আমার সাথে তর্ক করিস, এতো বড়ো স্পর্ধা! এতো বড়ো সাহস! দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা।"

এই কথা বলেই কৃষ্ণদেব মুচিরামকে নির্দেশ দিল, যা! একে নিয়ে গারদে আটকে রাখ। ওর উচিত মতো শাস্তির ব্যবস্থা কর।

তার নির্দেশে আমিন উল্লাহকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গেল মুচিরাম। গরাদের

ভেতর আবদ্ধ করে অত্যাচারী কৃষ্ণদেবের লোকেরা তার ওপর চালালো অকথ্য নির্যাতন। নির্মম-নিষ্ঠুর শারীরিক নির্যাতনের মুখেও এতোটুকু ভেংগে পড়েনি সে।

তখনো তার চোখে জ্বল জ্বল করে জ্বলে যাচ্ছে স্বাধীনতা এবং মুক্তির স্বপ্ন।

জ্বলে যাচ্ছে দেশ এবং জাতির কল্যাণের প্রদীপ।

তখনো তার সামনে ভাস্বরে উদ্দীপ্ত ঈমান এবং ইসলামের হুকুম আহকাম।

জীবনের চেয়ে সে ঈমানকে বড়ো করে দেখলো।

বড়ো করে দেখলো দেশ এবং জাতির মুক্তি।

জমিদারের পেটোয়া বাহিনীর অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে গেল।

চলতে থাকলো তার ওপর একের পর এক নিপীড়ন।

তাদের পাশবিক নির্যাতনের ফলে এক সময় নিস্তেজ হয়ে গেল আমিন উল্লাহর দেহ।

শহীদ হলো সে।

নিসার আলীর সংগ্রামী আন্দোলনের প্রথম শহীদ। শহীদ আমিন উল্লাহ।

প্রথম সংঘর্ষ

আঠারো শো একত্রিশ সালের কথা।

এসময়ে খাসপুরের জমিদারের অত্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। অকারণে অন্যায়ভাবে সে মুসলমানদের ওপর অমানুষিক জুলুম আর উৎপীড়ন শুরু করে দিল।

এসবই ছিল পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের পরামর্শ।

খাসপুরের জমিদারের অত্যাচারে টিকতে পারছিল না মুসলমানরা। তারা ছুটে এলো তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা—নিসার আলীর কাছে।

নিসার আলী বললেন, এবার রুখে দাঁড়ানো ছাড়া আরতো কোনো পথ দেখছিনা। পিঠতো দেয়ালে ঠেকেই গেছে।

সুতরাং রুখে দাঁড়াও!

নেতার আদেশ পেয়ে ক্রুদ্ধ এবং ক্ষত-বিক্ষত মুসলমানের একটি বিরাট দল রুখে দাঁড়ালো।

শুধু রুখে দাঁড়ালো না।

আল্লাহু আকবর ধ্বনি তুলে তারা জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীকে পরাস্ত করে ক্রমাগত সামনে অগ্রসর হতে লাগলো।

খাসপুরের প্রতাপশালী জমিদার!

এই প্রথম তার অত্যাচারের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ উঠলো। অত্যাচারিত এবং নির্যাতিত মানুষের কাছে মাথা নত করলো এই সর্বপ্রথম একজন জমিদার।

আরতো পেছনে ফেরা চলেনা !

ভাবলেন নিসার আলী।

ওদিকে পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেবও বাড়িয়ে দিয়েছে তার অত্যাচার আর জুলুম নির্যাতনের মাত্রা। তার নির্যাতনের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত মুসলমানরা।

নিসার আলী তার সাথীদেরকে নিয়ে এবার পুঁড়ার দিকে যাত্রা করলেন।

উদ্দেশ্য— কৃষ্ণদেবকে বুঝানো। যেন সে অন্যায়ভাবে তার প্রজাদের ওপর অত্যাচার না করে।

ইছামতী নদী পার হয়ে নিসার আলী তাঁর সাথীদেরকে পুঁড়ার জমিদার বাড়িতে প্রবেশের চেষ্টা করলো।

কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হলেন কৃষ্ণদেবের বাহিনীর কাছে।

জমিদার বাড়িতে তখন ঢাক-ঢোল বাজিয়ে মহা সমারোহে বারোয়ারী পূজা হচ্ছিল। নিসার আলীর সাথীদেরকে দেখে পূজায় অংশ গ্রহণকারীরা ভয়ে পালিয়ে গেল।

জমিদারের বাহিনীর সাথে নিসার আলীর এখানে সংঘর্ষ বেধে গেল। এই সংঘর্ষে কৃষ্ণদেবের পক্ষের একজন নিহত হলো।

পুরোহিতের নিহত হবার খবরটি সাথে সাথে পৌছে গেল বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেটের কানে। তিনি কদম গাছির দারোগাকে পাঠালেন তদন্তের জন্যে।

দারোগা ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ।

তিনি নিসার আলীকে গ্রেফতার এবং তাঁকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্যে রওয়ানা হলেন।

তার সাথে ছিল দেড়শতাধিক বরকন্দাজ এবং চৌকিদার।

কিন্তু দারোগার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। দারোগার বাহিনীর সাথে আবারও নিসার আলীর সংঘর্ষ হলো। এই সংঘর্ষে দারোগাসহ তার বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো।

দিন যত এগিয়ে যাচ্ছে, ততোই ঘনীভূত হয়ে উঠছে নিসার আলীর সংগ্রামের সাহসী চিত্র।

সম্মিলিত ষড়যন্ত্র

সাইয়েদ নিসার আলী এবং তাঁর অনুসারীদের দমন করার জন্যে জমিদাররা উঠে পড়ে লেগে গেল। তারা পরামর্শের জন্যে সকলে একত্রিত হলো।

নির্ধারিত সময়ে জমিদাররা একত্রিত হলো কলকাতার জনৈক লাটু বাবুর বাড়িতে।

এই সভায় হাজির ছিল— কলকাতার লাটু বাবু, গোবর ডাঙ্গার জমিদার কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গোবরা-গোবিন্দপুরের দেবনাথ রায়, নূর নগরের জমিদারের ম্যানেজার, টাকীর জমিদারের সদর নায়েব, রানা ঘাটের জমিদারের ম্যানেজার, পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়, বশীরহাট থানার দারোগা রাম রায় চক্রবর্তী, যদুর আটির দুর্গাচরণ চক্রবর্তী প্রমুখ।

সভায় তারা সিদ্ধান্ত নিল— যেহেতু নিসার আলীকে দমন করতে না পারলে আমাদের পতন অনিবার্য, সেই কারণে যে করেই হোক তাকে শায়েস্তা করতেই হবে। এ ব্যাপারে সকল জমিদার এক যোগে কাজ করবে এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করবে।

তারা নীলকরদের সাহায্যও নেবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। তাদেরকে বুঝানো হবে যে, নিসার আলী শুধু জমিদারদের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করছেন না, তিনি নীলকর এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম শুরু করেছেন। আর হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে এ কথা ঢাউস করে প্রচার করে দিতে হবে যে, নিসার আলী গোমাংসের দ্বারা হিন্দুর দেবালয়াদি অপবিত্র করছেন। হিন্দুর মুখে কাঁচা গো-মাংস গুজে দিয়ে তাদের জাতি নাশ করছেন।

বশীর হাটের দারোগা চক্রবর্তীকে এ ব্যাপারে সর্বপ্রকারের সাহায্য করার জন্যে অনুরোধ জানানো হলো।

জমিদার কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় দারোগাকে বললো, আপনি ব্রাহ্মণ।

আমরাও ব্রাহ্মণ। তাছাড়া আপনি আমাদের অনেকেরই আত্মীয়। আমাদের এই বিপদে আপনাকে সাহায্য করতেই হবে।

দারোগা তাদেরকে অভয় দিয়ে বললো, আমি আমার প্রাণ দিয়ে হলেও সাহায্য করবো এবং তিতুমীরকে রাজদ্রোহী প্রমাণ করবো।

কলকাতার এই ষড়যন্ত্র সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল নিসার আলীর যাবতীয় তৎপরতাকে নস্যাৎ করা।

অথচ নিসার আলী ছিলেন একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ।

তিনি চেয়েছিলেন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের ভাগ্যের উন্নতি ঘটাতে।

চেয়েছিলেন শান্তির পথে মুসলমানদের জাগরণ। চেয়েছিলেন কুসংস্কার বর্জিত প্রকৃত ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে।

তিনি চেয়েছিলেন বিদেশী শাসক, নীলকর কুঠিয়াল এবং অত্যাচারী হিন্দু জমিদারদের হাত থেকে গরীব কৃষক শ্রেণীকে রক্ষা করতে।

কিন্তু তাঁর এই শান্তির পথে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ালো তিনটি বৃহৎশক্তি— হিন্দু জমিদার, নীলকর কুঠিয়াল এবং ইংরেজ।

প্রতি পদে পদে এই ষড়যন্ত্রকারীদের মুকাবিলা করতে হলো সাইয়েদ নিসার আলীকে।

মসজিদটি পুড়িয়ে দিল

কলকাতার ষড়যন্ত্র সভার পর কৃষ্ণদেব আরও বেশি করে ক্ষেপে উঠলো। সে লোক পাঠালো সরফরাজপুরে। বললো, তাদের কাছ থেকে দাড়ি গোঁফের খাজনা এবং আরবী নামকরণের খারিজানা ফিস আদায় করে আনো।

তার লোকেরা যথা সময়ে সরফরাজপুর গেল।

তারা খাজনার কথা বললে সেখানকার মুসলমানরা তা দিতে অস্বীকার করলো।

তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে কৃষ্ণদেবকে সকল ঘটনা খুলে বললো।

সব শুনে কৃষ্ণদেব জ্বলে উঠলো।

সাথে সাথে বারোজন সশস্ত্র বরকন্দাজকে পাঠালো সেখানে। বললো, ওদেরকে এই মুহূর্তে আমার সামনে হাজির করতে হবে। তারপর মজাটা দেখিয়ে ছাড়বো তাদের।

কিন্তু বরকন্দাজরা ব্যর্থ হলো। তারা সাহস করেনি কাউকে গ্রেফতার করতে।

তাদের ব্যর্থতায় কৃষ্ণদেব রেগে গেল ভীষণভাবে। কিন্তু তাৎক্ষণিক ভাবে কিছুই করতে পারলো না।

কৃষ্ণদেব এবার পরামর্শের জন্যে বিভিন্ন জায়গায় তার লোক পাঠালো।

অনুকূল চন্দ্র গেল গোবর ডাঙায়।

খড়েশ্বর গেল গোবরা-গোবিন্দপুর।

লাল বিহারী গেল শেরপুর নীল কুঠির মিঃ বেনজামিনের কাছে।

বনমালী-গেল হুগলী নীল কুঠিতে এবং লোকনাথ গেল বশীর হাট থানায়।

কৃষ্ণদেবের অনুরোধে বিভিন্ন জায়গা থেকে সাহায্যের জন্যে সহস্রাধিক

লাঠিয়াল, ঢাল, শড়কী ও তলোয়ারধারী সশস্ত্র যোদ্ধারা তার বাড়িতে এসে জমা হলো।

পরদিন শুক্রবার।

নিসার আলী জুমআর নামায আদায় করছেন।

তাঁর সাথে আছে মসজিদ ভরা মুসল্লী।

খুতবা শেষে তারা যখন নামাযে দাঁড়িয়েছেন, তখনি তাদেরকে আক্রমণ করলো কৃষ্ণদেবের বাহিনী।

তারা মসজিদটিকে ঘিরে ফেলে আগুন লাগিয়ে দিল।

অগ্নি-দগ্ধ অবস্থায় মুসল্লীরা মসজিদের বাইরে এলে তাদের ওপর আক্রমণ করলো।

তাদের শড়কী বিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই দুজন মুসল্লী শহীদ হলেন এবং আহত হলেন অনেকেই।

নিসার আলী প্রাণে বেঁচে গেলেন।

কৃষ্ণদেবের তখনো রক্ত পিপাসা মেটেনি।

সে উন্মাদের মতো আশ-পাশের মুসলমানদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিল।

তাদের ওপর চালালো অকথ্য নির্যাতন। চলতেই থাকলো।

মিথ্যা মামলা

মসজিদটি পুড়িয়ে দেবার আঠারো দিন পরের ঘটনা।

নিসার আলী এবং তাঁর সাথীদেরকে নির্মূল করার জন্যে কৃষ্ণদেব রায় এবার নিজেই তাদের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করলো।

ইজাহারে সে বললো, "নিসার আলীর লোকেরা তার লোকজনকে মারপিট করেছে। তাকে ফাঁসানোর জন্যে তারা নিজেরাই তাদের মসজিদে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।"

ইজাহারে কৃষ্ণদেব তার গা বাঁচানোর জন্যে আরও বললো ঃ

"নীল চাষদ্রোহী, জমিদারদ্রোহী ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীদ্রোহী তিতুমীর নামক ভীষণ প্রকৃতির এক ওহাবী মুসলমান এবং তার সহস্রাধিক শিষ্য পুঁড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদেব রায় মহাশয়ের দুজন বরকন্দাজ ও একজন গোমস্তাকে অন্যায় ও বেআইনীভাবে কয়েদ করে গুম করেছে। বহু অনুসন্ধানেও আমরা তাদের পাচ্ছিনা। আমাদের উক্ত পাইক ও গোমস্তা সরফরাজপুর মহলের প্রজাদের নিকট খাজনা আদায়ের জন্য মহলে গিয়েছিল। খাজনার টাকা লেনদেন ও ওয়াশীল সম্বন্ধে প্রজাদের সাথে বচসা হওয়ায় তিতুমীরের হুকুম মতে তার দলের লোকেরা আমাদের গোমস্তা পাইকদেরকে জবরদস্তি করে কোথায় কয়েদ করেছে তা জানা যাচ্ছে না। তিতুমীর দম্ভভরে প্রচার করছে যে, সে এ দেশের রাজা। সুতরাং খাজনা আর জমিদারকে দিতে হবে না।"

অপর দিকে মুসলমানরা কলিঙ্গার পুলিশ ফাঁড়িতে কৃষ্ণদেব রায় ও তার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে খুন জখম মারপিট প্রভৃতির মামলা দায়ের করলো।

পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ইজাহার গ্রহণ করলো একপ্রকার বাধ্য হয়ে। কিন্তু এই ইজাহারের প্রতি তার কোনো আগ্রহ এবং শ্রদ্ধাবোধ ছিল না।

থাকবে কেন? সেটা যে ছিল মজলুমের ইজাহার!

মামলার রিপোর্ট

কৃষ্ণদেবের মিথ্যা মামলার প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে কলিঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির জমাদার।

জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের নায়েব তিতুমীর ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা দায়ের করেছে সে সম্পর্কে জমাদার একটি রিপোর্ট তৈরি করেন। তিনি রিপোর্টে উল্লেখ করেন ঃ

"তদন্ত করে জানা গেল যে, যেসব কর্মচারীর অপহরণের অভিযোগ করা হয়েছে তারা সকলেই নায়েবের সঙ্গেই আছে।.... আমার মতে এ জটিল মামলা দুটির তদন্ত ও ফাইনাল রিপোর্টের ভার বশীর হাটের অভিজ্ঞ দারোগা রাম রাম চক্রবর্তীর ওপর অর্পণ করা হোক।"

বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণদেব রায়কে কোর্টে তলব করে জামিন দেন। আর মামলাটি তদন্ত করে চূড়ান্ত রিপোর্ট দেয়ার আদেশ দেন রাম রাম চক্রবর্তীকে।

এই চক্রবর্তী ছিল কৃষ্ণদেবের একান্ত আস্থাভাজন অসৎ ব্যক্তি।

মামলার তদন্তের ভার পাওয়ায় সে খুব খুশি হলো। ছুটে চলে গেল সরফরাজপুর। কৃষ্ণদেবের বাড়িতে আরাম আয়েশে কাটিয়ে দিল কয়েকদিন। তারপর সে রিপোর্ট দিল। তার রিপোর্টে সে জানালো ঃ

১. "জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের গোমস্তা ও পাইকদেরকে তিতু ও তার লোকেরা বেআইনীভাবে কয়েদ করে রেখেছিল। পরে তারা কৌশলে পলায়ন করে আত্মগোপন করেছিল। পুলিশের আগমনের পর তারা আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং এ মামলা অচল ও বরখাস্তের যোগ্য।"

২. তিতুমীর ও তার লাঠিয়ালেরা জমিদার কৃষ্ণদেব রায় ও তার পাইক বরকন্দাজদের বিরুদ্ধে খুন জখম, লুট, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি মিথ্যা

অভিযোগ এনেছে।

৩. তিতু ও তার লোকেরা নিজেরাই নামাযাঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। অতএব এ মামলা চলতে পারে না।"

এই মামলায় নিসার আলীকে নিয়ে রাম রাম চক্রবর্তীর মনগড়া সাজানো রিপোর্টের কারণে জমিদার কৃষ্ণদেব রায় জয়লাভ করলো।

শুধু জয়লাভই নয়— সে এরপর থেকে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার আর শোষণের মাত্রা আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দিল।

আঠারো শো একত্রিশ সালের পঁচিশে সেপ্টেম্বর।

মামলার রায়ের নকলসহ মুসলমানরা কমিশনারের কোর্টে আপিল করার জন্যে কলকাতা গেল।

কিন্তু কমিশনারের অনুপস্থিতির জন্যে তারা আর আপত্তিও করতে পারলো না।

দ্বিতীয় সংঘর্ষ

সতেরই অক্টোবর, আঠারো শো একত্রিশ সাল।

নিসার আলী তাঁর পাঁচজন গৃহহারা, সম্পদহারা সাথীসহ সরফরাজপুর থেকে নারিকেল বাড়িয়ায় চলে এলেন।

সিদ্ধান্ত নিলেন, এখন থেকে নারিকেল বাড়িয়াতেই তিনি অবস্থান করবেন।

জমিদার কৃষ্ণদেব রায় সরফরাজপুর গ্রামের মসজিদটি ধ্বংস করলো।

বহু ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিল।

অনেক মানুষকে সে হতাহত করলো। হাবিবুল্লাহ, হাফিজুল্লাহ, গোলাম নবী, রমজান আলী ও রহমান বখশের ঘরবাড়িও জ্বালিয়ে দিল। মুসলমানদের ধনসম্পদ ভস্মিভূত ও লুণ্ঠন করলো।

কৃষ্ণদেবের অত্যাচারে সরফরাজপুরের মানুষের জীবন হয়ে উঠলো বিপন্ন।

এই বিপন্ন গ্রাম—সরফরাজপুর থেকে নিসার আলী তাঁর পাঁচজন অসহায় সাথীকে নিয়ে নারিকেল বাড়িয়ায় চলে এলেন।

কিন্তু এখানেও স্বস্তিতে থাকতে দিল না অত্যাচারী কৃষ্ণদেব রায়।

উনত্রিশে অক্টোবর, আঠারো শো একত্রিশ সাল।

কৃষ্ণদেব রায় সহস্রাধিক লাঠিয়াল ও বিভিন্ন অস্ত্রসাজে সজ্জিত একটি বাহিনী নিয়ে অকস্মাৎ আক্রমণ করলো নারিকেল বাড়িয়া গ্রাম।

তারা গ্রামে প্রবেশ করে বহু মানুষকে হতাহত করলো।

জ্বালিয়ে দিল অসংখ্য ঘরবাড়ি।

ত্রিশে অক্টোবর, আঠারো শো একত্রিশ সাল।

পুলিশ ফাঁড়িতে একটি ইজাহার দায়ের করা হলো। কিন্তু কোনো প্রকার তদন্তের জন্যেও পুলিশ এলোনা।

আঠারো শো একত্রিশ সালের ছয়ই নভেম্বর।

জমিদার কৃষ্ণদেব তার বাহিনী নিয়ে পুনরায় নারিকেল বাড়িয়ার মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করলো।

ধূর্ত কৃষ্ণদেব চার দিকে প্রচার করে দিল যে, অকারণে মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে।

এই সংবাদ শুনে গোবর ডাঙ্গার প্রতাপশালী জমিদার কালী প্রসন্ন তার একটি বিশাল সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হলো নারিকেল বাড়িয়ায়।

মোল্লা আলি নীল কুঠির ম্যানেজার মিঃ ডেভিস চারশো হাবশী যোদ্ধাসহ সেখানে উপস্থিত হলো।

এই সম্মিলিত সশস্ত্র বাহিনীটি হঠাৎ করে নিসার আলীদের ওপর আক্রমণ করলো।

আত্মরক্ষার জন্যে নিসার আলী তাঁর সাথীদেরকে পূর্ব থেকেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তারাও ছিলেন প্রস্তুত।

মুহূর্তে নারিকেল বাড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়ে উঠলো।

ভীষণ যুদ্ধ!

এই যুদ্ধে ডেভিড প্রাণ ভয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলো। জমিদারদের বহু লাঠিয়াল হতাহত হলো। বিক্ষুব্ধ মুসলমান নদী থেকে ডেভিডের বজরা ডাঙ্গায় তুলে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেললো।

এই ঘটনার কিছুদিন পর।

গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায় পুনরায় বিরাট এক সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করলো নিসার আলীর গ্রাম— নারিকেল বাড়িয়া।

এবারও মুসলমানরা সাহসিকতার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের ওপর।

পরাস্ত হলো তারা।

এই সংঘর্ষে নিহত হলো অত্যাচারী আর এক জমিদার— দেবনাথ রায়।

মনোহরের প্রতিক্রিয়া

কৃষ্ণদেবের এসব অত্যাচার আর অন্যায় বাড়াবাড়ির কথা জানতো অন্য এক জমিদার। সে হলো— চতুনার জমিদার মনোহর রায়।

মনোহর রায় কৃষ্ণদেবের এইসব ঘৃণ্য পদক্ষেপে খুবই মর্মাহত হলো।

তাকে ফেরানোর জন্যে সে একটি চিঠি দিল।

পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেবের কাছে লেখা মনোহর রায়ের চিঠির ভাষা ছিল এরকম ঃ

"নীলচাষের মোহ আপনাদেরকে পেয়ে বসেছে। তার ফলেই আজ আমরা দেবনাথ রায়ের ন্যায় একজন বীর পুরুষকে হারালাম।

এখনো সময় আছে। আর বাড়াবাড়ি না করে তিতুমীরকে তার কাজ করতে দিন। আর আপনারা আপনাদের কাজ করুন।

তিতুমীর তার ধর্ম প্রচার করছে। তাতে আপনারা জোট পাকিয়ে বাধা দিচ্ছেন কেন?

নীল চাষের মোহে আপনারা ইংরেজ নীলকরদের সাথে এবং পাদ্রীদের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে দেশবাসী ও কৃষক সম্প্রদায়ের যে সর্বনাশ করছেন তা তারা ভুলবে কি করে?

আপনারা যদি এভাবে দেশবাসীর ওপর গায়ে পড়ে অত্যাচার চালাতে থাকেন তাহলে বাধ্য হয়ে আমি তিতুমীরের সাহায্যের জন্যে অগ্রসর হবো।

আমি পুনরায় বলছি নীলচাষের জন্যে আপনারা দেশবাসীর অভিসম্পাত কুড়াবেন না।"

—শ্রী মনোহর রায় ভূষণ

কোনো প্রভাবশালী হিন্দুর পক্ষ থেকে এটাই ছিল নিসার আলীর জন্যে প্রথম সমবেদনামূলক চিঠি। চিঠিটার ঐতিহাসিক গুরুত্বও অপরিসীম।

তৃতীয় সংঘর্ষ

একটি দুষ্ট মহল গুজব ছড়িয়ে দিল চারদিকে। তারা প্রচার করতে থাকলো যে, শেরপুর নীলকুঠির ম্যানেজার বেনজামিন বহু লাঠিয়াল ও শড়কিওয়ালাসহ নারিকেল বাড়িয়া আক্রমণের জন্যে নদী পথে যাত্রা করেছে।

এই গুজবটি শুনার পর চিন্তায় পড়লেন নিসার আলী।

একের পর এক আক্রমণ আসছে তাদের ওপর। আর তারা তা মুকাবিলা করে যাচ্ছেন।

এখন কি করা যায়?

তিনি তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিলেন।

তাঁর বিশ্বস্ত সাথী গোলাম মাসুমকে বললেন ইছামতী নদীর দিকে এগিয়ে যেতে।

গোলাম মাসুম কিছু সাহসী সঙ্গী নিয়ে বেনজামিনের বাহিনীকে বাধা দেবার জন্যে এগিয়ে গেলেন।

নদীর কিছুটা দূরে বারঘরিয়া গ্রামের ঝোপঝাড় এবং জঙ্গলের ভেতর তারা লুকিয়ে থাকলেন এবং নদীর ঘাটের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন।

এক সময় বজরা এসে নদীর ঘাটে ভিড়লো।

নিসার আলীর লোকেরা দেখতে পেলেন বজরায় দুজন ইংরেজ এবং জমিদার কৃষ্ণদেব আছে।

ইংরেজ দুজনকে তারা বেনজামিন আর ডেভিস বলে ধারণা করে তাদের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিলেন।

কৃষ্ণদেব তাদেরকে দেখতে পেল। সে বললো, ঐ দেখুন হুজুর! তিতুমীরের প্রধান সেনাপতি গোলাম মাসুম বজরা আক্রমণ করার জন্যে এতোদূর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে!

কৃষ্ণদেবের কথা শেষ না হতেই সাহেব সাথে সাথে গুলী চালাবার নির্দেশ দিল।

অপরপক্ষও তীর শড়কী চালাতে লাগলেন।

উভয় পক্ষের বেশ কিছু মানুষ হতাহত হলো।

কালেক্টর তখন যুদ্ধ বন্ধ রেখে নদীর মাঝখানে গিয়ে আত্মরক্ষা করলো।

কিন্তু কপাল মন্দ কৃষ্ণদেবের।

সে দ্রুত বজরায় উঠে নদীর মাঝখানে গিয়ে প্রাণে বাঁচতে চাইছিলো।

কিন্তু পারলোনা।

নদীতে পড়ে গেল এবং সেই বারঘরিয়ার নদীর পানিতে ডুবে কৃষ্ণদেব মারা গেল।

তাকে কোনো মুসলমান হত্যা করেনি।

এই সংঘর্ষে যদিও নিসার আলীর দলের বিজয় হয়েছিল, তবুও তাঁদের এই সংঘর্ষটি ছিল সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে। অনভিপ্রেত।

যারা তাদের ধোঁকার মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেয়েছিল— মূলত তারাই সফল হলো। কারণ এই সংঘর্ষের ফলে ইংরেজরাও ক্ষেপে উঠলো নিসার আলীর বিরুদ্ধে।

চতুর্থ সংঘর্ষ

চৌদ্দই নভেম্বর, আঠারো শো একত্রিশ সাল।

নিসার আলীকে নির্মূল করার জন্যে বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আলেকজান্ডার একজন হাবিলদার, একজন জমাদার এবং পঞ্চাশ জন বন্দুক ও তরবারিধারী সিপাহী নিয়ে পৌঁছেন নারিকেল বাড়িয়ার তিন ক্রোশ দূরে— বাদুড়িয়ায়।

বশির হাটের দারোগা নিমাই জমাদার সহ বাদুড়িয়ায় আলেকজান্ডারের সাথে মিলিত হলো।

উভয়ের মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় একশো বিশজন।

মুসলিম দলের নেতৃত্বে ছিলেন দুঃসাহসিক মুজাহিদ গোলাম মাসুম।

গোলাম মাসুমের সাথে আলেকজান্ডারের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হলো বাদুড়িয়ায়।

সংঘর্ষে তারা পরাজিত হলো।

উভয় পক্ষের অনেক লোক হতাহত হলো।

গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে মুসলমানদের দুঃসাহস এবং বীরত্ব দেখে বিস্মিত হলো আলেকজান্ডার।

এই সংঘর্ষে একজন দারোগা ও একজন জমাদার মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হলো।

অবস্থা বেগতিক দেখে আলেকজান্ডার পালিয়ে গেল।

ঐতিহাসিক বাঁশের কেল্লা

আঠারো শো একত্রিশ সাল।

গোটা বছরই নিসার আলীর জন্যে ছিল একটি কঠিন অগ্নিপরীক্ষার কাল।

এই বছরই তাঁকে মুকাবিলা করতে হয়েছে হিন্দু জমিদারদের চ্যালেঞ্জ ও আক্রমণ। একের পর এক।

এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি সম্মুখ সংঘর্ষ হয়ে গেছে।

সেই সংঘর্ষে তাঁকে এগিয়ে যেতে হয়েছে।

তাঁর সাথীদের বেশ কয়েকজন হতাহতও হয়েছে।

অনেকের ঘরবাড়ি, সহায় সম্পদ জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করে দিয়েছে জমিদাররা।

এসবই ঘটেছে একটি বছরের মধ্যে।

নিসার আলী লক্ষ্য করলেন, এখন আর কেবল হিন্দু জমিদার বা নীল কুঠিয়ালরাই নয়, তাদের সাথে ইংরেজরাও যুক্ত হয়েছে। তারা সম্মিলিতভাবে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ব্যাপারটি বুঝতে পেরে সতর্ক নিসার আলী পূর্ব থেকেই আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুতি নিলেন।

প্রস্তুতি নিলেন তাঁর সাথীদেরকে রক্ষার জন্যে।

এই প্রস্তুতির কার্যক্রম হিসাবে তিনি তৈরি করলেন নারিকেল বাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা।

নিসার আলীর হুজরাকে কেন্দ্র করে তাঁর সাথীরা চারদিকে মোটা মোটা ও মজবুত বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঘিরে ফেলেছিলেন।

বাঁশ দিয়ে কেল্লাটি তৈরি করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ইতিহাসে এটি 'তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা' নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

মহা সংঘর্ষের সূচনা পর্ব

জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আলেকজান্ডার পালিয়ে গিয়ে বারাসতে পৌঁছুলো।

সেখানে পৌঁছে সে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে নিসার আলীকে শায়েস্তা করার জন্যে আবেদন জানিয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করলো।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আলেকজান্ডারের রিপোর্ট পাওয়ার পর কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল।

দেরি না করে কোম্পানী সরকার কর্ণেল স্টুয়ার্টকে সেনাপতি নিযুক্ত করে তার অধীনে একশো ঘোড়সওয়ার গোরা সৈন্য, তিনশো পদাতিক সৈন্য, দুটি কামান ও প্রচুর গোলা বারুদসহ পাঠিয়ে দিল নারিকেল বাড়িয়ার দিকে।

কোম্পানীর সৈন্যরা নারিকেল বাড়ি পৌঁছে গ্রামটিকে অবরোধ করে ফেললো।

সময়টা ছিল আঠারো শো একত্রিশ সালের উনিশে নভেম্বর।

কর্ণেল স্টুয়ার্ট নিসার আলীর হুজরাঘরের সামনে গিয়ে দেখলো, এক ব্যক্তি সাদা তহবন্দ, সাদা পিরহান ও সাদা পাগড়ি পরে তসবিহ্ হাতে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন।

স্টুয়ার্ট অবাক হয়ে রামচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলো, "এই ব্যক্তিই কি তিতুমীর? একে তো বিদ্রোহী বলে মনে হয় না?"

রামচন্দ্র বানিয়ে বানিয়ে মনগড়া মিথ্যা বললো, " হ্যা, এই ব্যক্তিই বিদ্রোহী তিতুমীর। নিজেকে তিতু বাদশাহ্ বলে পরিচয় দেয়। আজ আপনাদের আসার কারণে ভোল পাল্টে সাধু সেজেছে হুজুর!"

স্টুয়ার্ট রামচন্দ্রকে বললো,

"তিতুকে বলুন, আমি বড়ো লাট লর্ড বেন্টিংক-এর পক্ষ থেকে সেনাপতি হিসাবে এসেছি। তিতুমীর যেন আত্মসমর্পণ করেন। অথবা তিনি যা বলতে চান তা যেন হুবহু আমাকে বলেন।"

রামচন্দ্র সেসব না বলে বরং তিতুমীরকে বললো ঃ "আপনি কোম্পানী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এখন জপমালা ধারণ করেছেন। আসুন তরবারি ধারণ করে বাদশাহর যোগ্য পরিচয় দিন।"

তিতুমীর বললেন, "আমি কোম্পানী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি। হিন্দুদের মতো আমরাও কোম্পানী সরকারের প্রজা। জমিদার নীলকরদের অত্যাচার দমনের জন্যে এবং মুসলমান নামধারীদেরকে প্রকৃত মুসলমান বানানোর জন্যে সামান্য চেষ্টা করেছি মাত্র।"

নিসার আলীর জবাব শুনার পর রামচন্দ্র দোভাষী হিসাবে স্টুয়ার্টকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বললো। সে স্টুয়ার্টকে বুঝালো, "তিতুমীর বলছে আত্মসমর্পণ করবে না। যুদ্ধ করবে। সে বলে যে, তোপ ও গোলাগুলীকে সে তোয়াক্কা করেনা। সে বলে যে, তার ক্ষমতা বলে সবাইকে টপ টপ করে গিলে খাবে। সেই এদেশের বাদশাহ, কোম্পানী আবার কে?"

রামচন্দ্র দোভাষীর কাজ করার সুযোগ নিয়ে মুহূর্তেই জ্বালিয়ে দিল মহা সংঘর্ষের বিধ্বংসী আগুন।

রামচন্দ্রের এই বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ মিথ্যাচার এতটুকুও বুঝে উঠতে পারেনি স্টুয়ার্ট। রামচন্দের মুখে নিসার আলীর না বলা এইসব বানানো কথা শুনেই স্টুয়ার্ট হিংস্র পশুর মতো ক্ষেপে গেল। এবং তারপর নির্দেশ দিল যুদ্ধের।

স্টুয়ার্টের সাথে আরও ছিল তুখোড় সৈনিক ক্যাপ্টেন সাদারল্যান্ড, ক্যাপ্টেন শেকস্‌পীয়র প্রমুখ।

শেষ সংগ্রাম

রামচন্দ্রের জ্বালিয়ে দেয়া আগুনে জ্বলে উঠলো নারিকেল বাড়িয়া।

মুখোমুখি হলো কোম্পানী সরকারের সশস্ত্র সৈন্য এবং নিসার আলীর সাথীরা।

সে এক অসম যুদ্ধ!

তবু একটুও ঘাবড়ালেন না নিসার আলীর সাহসী সৈনিকেরা। তাঁরা ক্রমাগত এগিয়ে গেলেন।

এগিয়ে গেলেন ইংরেজদের কামানের গোলাকে উপেক্ষা করে।

একদিকে ইংরেজদের ভারী কামান, রাইফেল এবং সুশিক্ষিত সৈন্য।

অপর দিকে নিসার আলীর লাঠি, শড়কী ও তীর ধনুকে সজ্জিত একদল জানবাজ দুঃসাহসী বাহিনী।

তারপরও কাঁপলো না মুসলমান বাহিনীর বুক।

তাঁরা তখনো এগিয়ে যাচ্ছেন।

ক্রমাগত সামনে।

এক সময় ইংরেজদের প্রচণ্ড কামানের গোলার মুখে ধ্বংস হয়ে গেল ঐতিহাসিক বাঁশের কেল্লা।

তবুও ভীত সন্ত্রস্ত হলেন না তারা।

আনুগত্য বা আত্মসমর্পণও করলেন না ইংরেজ বহিনীর কাছে।

নিসার আলী তার সাথীদেরকে জানিয়ে দিলেন, যুদ্ধ চালিয়ে যাও! শাহাদাতই আমাদের সর্বশেষ মঞ্জিল!

নেতার নির্দেশ।

তাঁদের বুকেও ঈমানের সাহসী তুফান।

সেই অশান্ত তুফানে দুলে দুলে উঠছে তাঁদের প্রশস্ত বুক।

তাঁরা ইংরেজ দস্যুদের কামান গোলাকে উপেক্ষা করে সমানে এগিয়ে চলেছেন। এবং তারপর।—

তারপর যুদ্ধ করতে করতে একসময় নিসার আলীসহ অনেকেই ঢলে পড়লেন শাহাদাতের কোমল বিছানায়।

শহীদ হলেন নিসার আলী!

শহীদ হলেন তাঁর পুত্র জওহর আলী ও আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ময়েজউদ্দীন।

এভাবে একে একে শহীদ হলেন পঞ্চাশ জন তেজদীপ্ত সৈনিক।

ইংরেজদের হাতে বন্দী হলেন সাড়ে তিনশো বীর মুজাহিদ।

ইংরেজ দস্যুরা যুদ্ধ শেষে মৃতদেহগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেললো।

নিসার আলীর দলের লোকদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিল।

তাঁদের সহায় সম্পদ লুট করে নিল এবং সন্দেহভাজনদেরকে গ্রেফতার করলো।

এই সংঘর্ষের পর ইংরেজ সরকার সর্বমোট একশো সাতানব্বই জনের বিচার করেছিল।

এদের মধ্যে প্রধান সেনাপতি— নিসার আলীর ভাগ্নে গোলাম মাসুমকে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়েছিল।

এগার জনের যাবজ্জীবন এবং একশো আঠাশ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল।

বিচারকালে চার জনের মৃত্যু হয় এবং তিপ্পান্ন জন খালাস পায়।

এদের মধ্যে ছিলেন— তিতুমীরের দুই পুত্র মীর তোরাব আলী ও মীর গাওহর আলী।

নিসার আলীর জ্যেষ্ঠপুত্র গাওহার আলীর বাম হাত গোলার আঘাতে উড়ে গিয়েছিল বলে তাকে কারাদণ্ড থেকে মুক্তি দিয়েছিল। আর অন্য পুত্র তোরাব আলীর বয়স কম ছিল বলে তাঁর দু বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

নিসার আলীর প্রধান সেনাপতি গোলাম মাসুমকে গ্রেফতার করার পর তাঁকে

দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছিল।

গোলাম মাসুম ইংরেজদের এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন।

এরপরই কেল্লার পুবপাশে গোলাম মাসুমকে ফাঁসি দিয়ে শহীদ করা হয়।

এই যুদ্ধ সম্পর্কে ইংরেজ সেনাপতি মেজর স্কট আফসোসের সাথে মন্তব্য করে বলেছেন ঃ

"যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছি ঠিকই। কিন্তু এতে প্রাণ দিয়েছেন একজন ধর্মপ্রাণ দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ।"

স্কটের এই ছোট্ট মন্তব্যটি অবশ্যই ব্যাপক বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

ইংরেজদের সাথে নিসার আলীর এই সর্বশেষ অসম মহা সংঘর্ষটি বাধে আঠারো শো একত্রিশ সালের উনিশে নভেম্বর।

ফজর নামাযের পর।

শেষের কথা

সতেরো শো সাতান্ন সালের, তেইশে জুন পলাশীর যুদ্ধে সিরাজুদ্দৌলাহর পরাজয়ের পর ইংরেজরা বাংলার বুকে শোষণের হাতিয়ার নিয়ে চিরস্থায়ীভাবে আসন গেড়ে বসে যায়।

নবাব সিরাজের মৃত্যুর পর ইংরেজরা নবাবের আসনে বসায় কুখ্যাত বিশ্বাসঘাতক— মীর জাফরকে।

সতেরো শো পঁয়ষট্টি সালে মীর জাফর মারাত্মক কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

মীর জাফর ক্ষমতাচ্যুত হলো সতেরো শো ষাট সালে।

এরপর মীর কাসিম বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন সেই একই বছরে, সতেরো শো ষাট সালে।

মীর কাসিম ছিলেন একজন যোগ্য ও দক্ষ শাসক। তিনি কঠোর হস্তে শাসন কার্য পরিচালনা করতে থাকেন।

ইংরেজদের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনার জন্যে নিজস্ব সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন এবং রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তর করেন।

মীর কাসিম ছিলেন ন্যায়পরায়ণ সাহসী সৈনিক। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে দেওয়া বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার রহিত করেন। ফলে ইংরেজদের সাথে তাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

অবশেষে সতেরো শো চৌষট্টি সালের তেইশে অক্টোবর বক্সারের এক অসম যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর কাছে মীর কাসিম পরাজিত হন।

সতেরো শো সাতাত্তর সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

মীর কাসিমের পরাজয়ের পর ইংরেজরা আরও বেশি হিংস্র এবং ক্ষুধার্ত হয়ে উঠলো। ক্ষুধা মিটানোর জন্যে তারা সমগ্র বাংলাকে নিংড়ে চটকে শোষণ

করে নিল। তবুও তাদের ক্ষুধার আগুন নেভেনি।

এই ষড়যন্ত্রকারী ইংরেজদের সাথে সেদিন হাত মিলিয়েছিল বাংলার উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং জমিদাররা।

ইংরেজদের কৃপায় জমিদারী ক্ষমতা লাভ করার পর এই শ্রেণীর হিন্দুরাও অত্যাচারী হয়ে ওঠে। তাদের আসমুদ্র ক্ষুধা মেটাতে তারাও সকল সময়ে বাংলার সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষকে সাধ্য মতো শোষণ করেছে।

একদিকে ইংরেজের অত্যাচার।

অপরদিকে হিন্দু জমিদারদের নিপীড়ন।

তার পাশাপাশি চলেছে নীল কুঠিয়ালদের নির্যাতন।

এই ত্রিবিধ অত্যাচার আর শোষণের যাঁতাকলে বাংলার মানুষেরা শোষিত হয়ে এসেছে বরাবর।

তাদের শাসন আর শোষণ থেকে মুক্তির জন্যে এই বাংলার মাটিতে সংগ্রামের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠেছে বারবার।

অন্যায়ের কাছে মাথানত করেননি সেইসব সংগ্রামী পুরুষ।

নবাব সিরাজুদ্দৌলাহ, মীর কাসিমসহ অসংখ্য দুঃসাহসী পুরুষ নিজেদের জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে বাংলার মানুষের মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করে গেছেন।

এই সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় এসেছেন মজনু শাহ। যিনি 'ফকির বিদ্রোহের' মাধ্যমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমৃত্যু লড়ে গেছেন। তাঁর এই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চলেছিল সতেরো শো চৌষট্টির পর থেকে একটানা আঠারো শো তেত্রিশ - চৌত্রিশ সাল পর্যন্ত।

সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় এসেছেন সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী। এসেছেন হাজী শরীয়তুল্লাহ, সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর প্রমুখ দুঃসাহসী সংগ্রামী নেতা।

বাংলার মাটি মানেই সাহসের আগ্নেয়গিরি!

এই বাংলায় প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের জন্যে সংঘটিত হয়েছে ফকির

বিদ্রোহ। হয়েছে ফরায়েজী আন্দোলন, সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর জিহাদী আন্দোলন এবং নিসার আলীর অগ্নিময় সংগ্রামী আন্দোলন।

আঠারো শো সাতান্ন সালের আজাদী আন্দোলনও ছিল ইংরেজ ও হিন্দু জমিদার কর্তৃক মুসলমানদের ওপর অমানুষিক ও পৈশাচিক আচরণের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

সতেরো শো সাতান্ন সাল থেকে পরবর্তী সময়গুলো ছিল মুসলমানদের জন্যে একটি কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সময়।

মুসলমানদের হাত থেকে ক্ষমতা, রাজত্ব চলে যাবার পর সমগ্র বাংলায় ইংরেজ ও তাদের দোসররা কায়েম করেছিল অরাজকতার এক ভয়াবহ জাহান্নাম।

মুসলমানকে তারা কেবল রাজ্য ও ক্ষমতাচ্যুতই করেনি— তাদেরকে নিশ্চিহ্ন এবং নির্মূল করার জন্যেও চালিয়েছিল ষড়যন্ত্র আর শোষণের নব নব কৌশল।

অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তারা বিস্তার করেছিল তাদের কালো থাবা। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত নিম্নবিত্ত মুসলমানকে তারা বিভিন্ন অপকৌশলে বিভ্রান্ত করতো। নিজস্ব ধর্ম এবং সংস্কৃতি থেকে তাদেরকে সুকৌশলে দূরে সরিয়ে রাখতো।

নিসার আলীর সময়েও মুসলমানদের ওপর চলছিল তাদের এইসব অপতৎপরতা ।

সময়টা এতোই নাজুক হয়ে পড়েছিল যে, তারা ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিল।

মুসলমানের বুকের ওপর চেপে বসেছিল ইংরেজ এবং জমিদাররা।

তারা মুসলমানী সংস্কৃতি বাদ দিয়ে তাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিল হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি। তহবন্দের পরিবর্তে ধূতি, সালামের পরিবর্তে আদাব-নমস্কার, পূজার জন্যে পশু আদায়, চাঁদা আদায়, দাড়ির ওপর ট্যাক্স, মসজিদ তৈরি করলে নজরানা, খাজনা, গরু জবাই করলে ডান হাত কেটে দেয়া

প্রভৃতি জুলুম অষ্টপ্রহর চলছিল মুসলমানের ওপর।

সমগ্র বাংলার অবস্থা যখন এমনি নাজুক, ঠিক তখনি জিহাদী আন্দোলনের ডাক দিলেন সংগ্রামী এক নেতা— সাইয়েদ নিসার আলী। তাঁর সংগ্রাম ছিল জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধেও। তিনি বললেন— "লাঙ্গল যার জমি তার।"

তিনি আবার বললেন— "প্রত্যেকের শ্রমের ফসল তাকেই ভোগ করতে দিতে হবে।"

সাধারণ মুসলমানের নৈতিক অধঃপতন থেকে মুক্ত করার জন্যে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

বাংলার মানুষকে মুক্ত করার জন্যে, তাদের অধিকার এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্যে নিসার আলীকে একই সাথে হিন্দু জমিদার, নীল কুঠিয়াল এবং ইংরেজ দস্যুদের মুকাবিলা করতে হয়েছে।

তিনি যে সংগ্রাম করেছিলেন তা পরবর্তীকালে মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও আজাদীর পথে এক অসামান্য আলোকবর্তিকার কাজ করেছে।

কাজটি আদৌ সহজ ছিলনা। পথটিও ছিলনা মসৃণ।

কাজটি ছিল অত্যন্ত কঠিন। কঠিন এবং দুঃসাধ্য।

এই দুঃসাধ্য কাজটি করতে করতে বাংলার মুসলমানদের বুকে স্বপ্ন এবং সংগ্রামের আগুন উসকে দিয়ে দুঃসাহসী অগ্রসেনানী একদিন শহীদ হয়ে গেলেন।

শহীদের পেয়ালা হাসিমুখে পান করলেন বাংলার এক সাহসী সেনাপতি সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর।

সাইয়েদ নিসার আলী!

নিসার আলী ছিলেন বাংলার মুসলমানের জন্যে সংগ্রাম, শাহাদাত ও আজাদী আন্দোলনের এক অসাধারণ স্বপ্নপুরুষ।

এক নজরে নিসার আলী

নাম : সাইয়্যেদ নিসার আলী। পরিচিতি ও খ্যাতিতে যুক্ত হয় 'তিতুমীর'।

পিতা : সাইয়েদ (মীর) হাসান আলী।

মাতা : আবেদা রোকাইয়া খাতুন।

জন্ম : ১৭৮২ সাল।

জন্মস্থান : গ্রাম- চাঁদপুর, জিলা- চব্বিশ পরগণা।

ছোটদাদা : সাইয়েদ ওমর দারাজ রাজী।

বিবাহ : স্ত্রী – মায়মুনা সিদ্দিকা।

শ্বশুর : শাহ সুফী মুহাম্মদ রহীমুল্লাহ সিদ্দিকী।

দাদা শ্বশুর : শাহ সুফী মুহাম্মদ আসমতুল্লাহ সিদ্দিকী।

সন্তান : প্রথম পুত্র– সাইয়েদ গাওহার আলী। ১৮৩১ সালে ১৯ নভেম্বর নারিকেল বাড়িয়ার সংঘর্ষে তার একটি হাত উড়ে যায় কামানের গোলায়।

দ্বিতীয় পুত্র : সাইয়েদ জওহার আলী। ঐ একই সংঘর্ষে পিতার সাথে শহীদ হন।

তৃতীয় পুত্র : সাইয়েদ তোরাব আলী। বয়স অল্প হওয়া সত্ত্বেও নারিকেল বাড়িয়ার সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করেন এবং মারাত্মকভাবে আহত হন।

বংশপরম্পরা : সাইয়েদ আব্বাস আলী ও সাইয়েদ শাহাদাত আলী ছিলেন আপন দুই ভাই। তারা ছিলেন দরবেশ এবং ইসলাম প্রচারক।

শাহাদাত আলীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন সাইয়েদ হাসমত আলী। তিনিও ছিলেন দরবেশ এবং ইসলাম প্রচারক। এই দরবেশ এবং ইসলাম প্রচারক

পরিবারের হাশমত আলীর ত্রিশতম অধস্তন হলেন সাইয়েদ নিসার আলী।

শিক্ষা জীবন : ১৭৮৬ সাল। চার বছর চার মাস চার দিন বয়সে প্রথম ধর্মীয় তালিমের মাধ্যমে শিক্ষা জীবন শুরু।

তারপর বাড়িতেই পণ্ডিত লাল মিয়ার কাছে আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষা শেখেন।

পণ্ডিত রাম কমল ভট্টাচার্যের কাছে শেখেন বাংলা, গণিত প্রভৃতি বিষয়।

হাফেজ নিয়ামতুল্লাহকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দিয়ে চাঁদপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি আধুনিক মাদ্রাসা। সেই মাদ্রাসায় হাফেজ নিয়ামতুল্লাহর কাছে নিসার আলী পরবর্তী শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি কুরআনে হাফেজ হন। আরবী ব্যাকরণ, তাসাউফ, ফারায়েজ, আরবী, ফারসী কাব্য ও সাহিত্যে তিনি যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এসব ভাষায় তিনি অনর্গল বক্তৃতাও দিতে পারতেন।

শিক্ষাজীবন সমাপ্তি : ১৮০৪ সালে। ১৮ বছর বয়সে।

ছোট দাদার ইন্তিকাল : নিসার আলীর বিয়ের ১৪ দিন পর ইন্তিকাল করেন ছোট দাদা সাইয়েদ ওমর দারাজ রাজী।

পিতার ইন্তিকাল : এর ৬ মাস পর ইন্তিকাল করেন পিতা হাসান আলী।

ভ্রমণ : প্রিয় শিক্ষক হাফেজ নিয়ামতুল্লাহর সাথে ছাত্রাবস্থায় সেই কৈশোর বয়সে ভ্রমণ করেন বাংলার বাইরে— বিহার শরীফ ও তার আশ-পাশের বেশ কয়েকটি দেশ।

বিয়ের দেড় বছর পর কলকাতায় আসেন। ওঠেন তালতলার বিখ্যাত ব্যক্তি হাফেজ মুহাম্মদ ইসরাইলের বাসায়।

হজ্জ পালনের জন্যে মক্কায় যান ১৮২৩ সালে। ৪১ বছর বয়সে।

হজ্জ পালনের জন্যে মক্কায় যাবার পর তিনি ভ্রমণ করেন মক্কা ছাড়াও মদীনা, কূফা, কারবালা, দামেশক, সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ ও পবিত্র স্থানসমূহ।

কুস্তি শিক্ষা : চাঁদপুর ও কলকাতার তালতলার আখড়ায়।

ধর্মীয় মুর্শিদ বা পীর : সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী।

১৮২৩ সালে মক্কায় হজ্জ করতে গেলে বেরেলভীর সাথে সাক্ষাত হয় এবং তিনি তাঁর মুরীদ হন।

স্বদেশের পথে : ১৮২৭ সালে মক্কা থেকে ফিরে আসেন স্বদেশে। মক্কায় ছিলেন দীর্ঘ ৪ বছর।

দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু : মক্কা থেকে ফেরার পর। অর্থাৎ ১৮২৭ সালে দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করেন।

প্রথম সংঘর্ষ : ১৮৩১ সালে। খাসপুরের জমিদারের সাথে এবং বিজয় লাভ।

দ্বিতীয় সংঘর্ষ : ১৮৩১ সালের ১৭ অক্টোবর, পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের সাথে এবং বিজয় লাভ।

তৃতীয় সংঘর্ষ : ১৮৩১ সালের নভেম্বরের প্রথম দিকে। কয়েকজন ইংরেজ এবং কৃষ্ণদেবের সাথে। এখানেও নিসার আলীর সাথীরা বিজয় লাভ করলেন। এই সংঘর্ষের মধ্যেই প্রাণে বাঁচার জন্যে বজরায় উঠতে ব্যর্থ হয়ে কৃষ্ণদেব নদীতে ডুবে মারা যায়।

চতুর্থ সংঘর্ষ : ১৮৩১ সালের ১৪ নভেম্বর। নারিকেল বাড়িয়ার তিন ক্রোশ দূরে, বাদুড়িয়ায়। প্রতিপক্ষে ছিল বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আলেকজান্ডার, একজন হাবিলদার, একজন জমাদার এবং পঞ্চাশজন সশস্ত্র সিপাহী। বশির হাটের দারোগাও সিপাই জমাদারসহ বাদুড়িয়ায় আলেকজান্ডারের সাথে মিলিত হয়ে আক্রমণ করে। এই সংঘর্ষেও বিজয়ী হন নিসার আলী।

বাঁশের কেল্লা নির্মাণ : ১৮৩১ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে, নারিকেল বাড়িয়ায়।

সর্বশেষ সংঘর্ষ : ১৮৩১ সালের ১৯ নভেম্বর। বাদ ফজর। নারিকেল

বাড়িয়ায়। সুসজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর সাথে তাঁর সর্বশেষ সংঘর্ষ হয়।

শাহাদাত : ১৮৩১ সালের ১৯ নভেম্বর। নারিকেল বাড়িয়ার যুদ্ধে।

সংগ্রামের শুরু : ১৮২৭ সাল। মক্কা থেকে স্বদেশে ফিরে এসে।

সংগ্রামী জীবনের শেষ : ১৮৩১ সালের ১৯ নভেম্বর। শাহাদাতের মাধ্যমে।

সংগ্রামের সময় কাল : ১৮২৭ থেকে ১৮৩১ সাল; ৪ বছর।

জীবন কাল : ১৭৮২ থেকে ১৮৩১ সাল; ৪৯ বছর।■